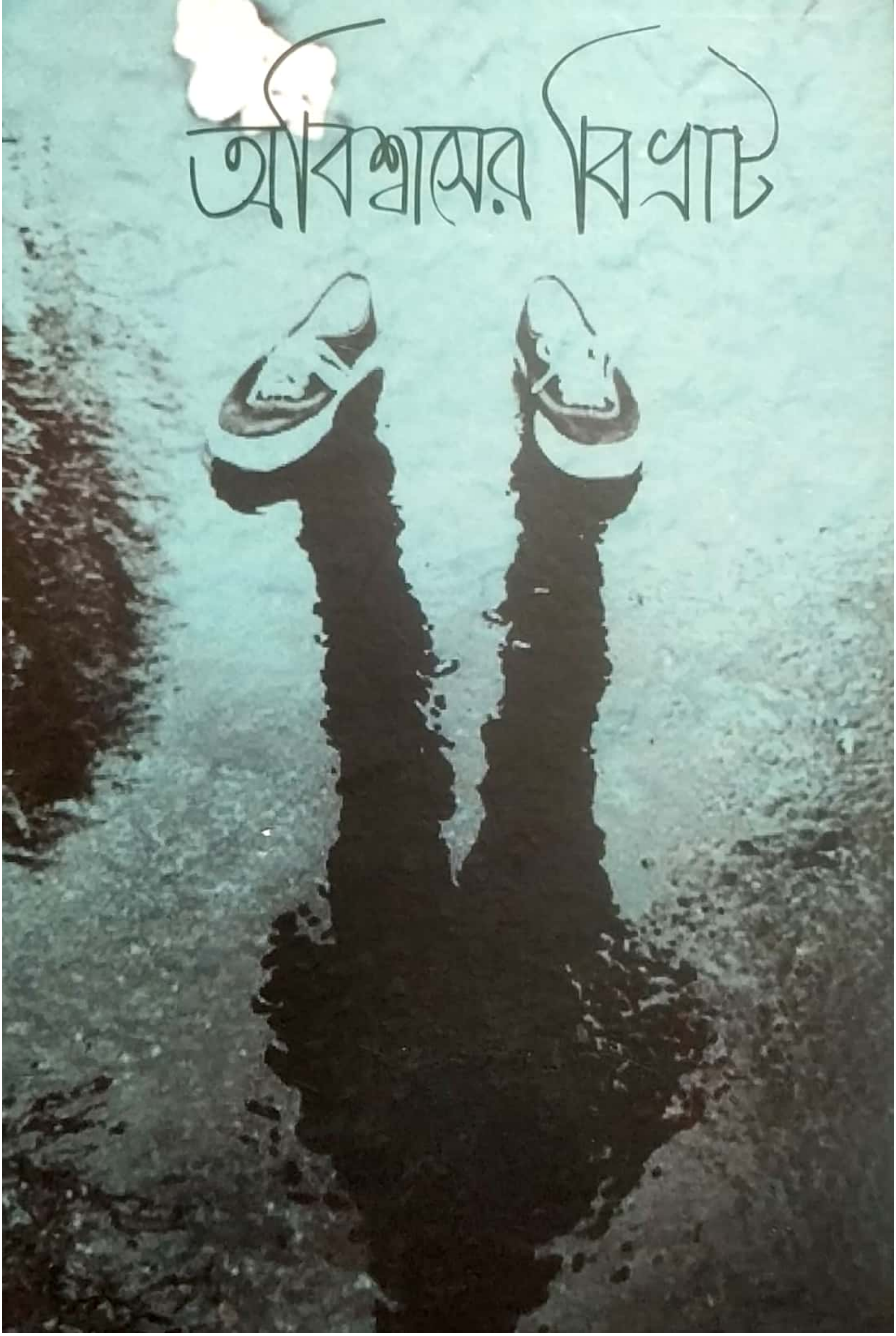

Scanned by CamScanner

অবিশ্বাসের বিভ্রাট

সংকলন

সম্পাদনা

মুহাম্মাদ শাকিল হুসাইন

শর'ঈ সম্পাদনা

শায়খ আবু আম্মার

মিনারাহ পাবলিকেশন্স

Scanned by CamScanner

অবিশ্বাসের বিভ্রাট
গ্রন্থস্বত্ব ©গ্রন্থকার

ISBN: 978-984-35-3508-7

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৪০ হিজরী / জুন, ২০১৯ খ্রিঃ

নির্ধারিত মূল্যঃ ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

পরিবেশক: তাযকিয়াহ লাইফ
৩৪ বাংলাবাজার, মাদ্রাসা মার্কেট (৩য় তলা)
+৮৮ ০১৬৭০ ২৮ ১৪ ৩৮
www.tazkiyahlife.net

প্রকাশক
মিনারাহ পাবলিকেশন্স
minarahbd@gmail.com
facebook.com/minarahpublicationsbd

Obishwasher Bivrat (Befuddlement of Disbelief) published by Minarah Publications, Dhaka, Bangladesh, First Edition in June 2019.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

অবিশ্বাসের বিভ্রাট

Scanned by CamScanner

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই; আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল্লাহর প্রেরিত নবীদের ধারাবাহিকতায় প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতি রহমতস্বরুপ হেদায়াত নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

হকের সাথে বাতিলের সংঘর্ষ চিরন্তন ও বাস্তব সত্য। সৃষ্টির শুরু থেকেই হকের সাথে বাতিলের এই দ্বন্দ্ব চলে আসছে। চিরশত্রু শয়তান আল্লাহর সাথে তার কৃত ওয়াদা মোতাবেক সবসময় ব্যস্ত আল্লাহর বান্দাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে সরিয়ে নিতে। শয়তান বিড়ালের মত পায়ের আওয়াজ না করে সামনে আসে, কখনো বা পেছনে থেকে হামলা করে, কখনো বা দোস্তের রুপ ধরে আসে। প্রতিদিন চলতে থাকে তার শিডিউল। সে সবসময়ই ব্যস্ত মানুষকে তার মত অভিশাপের রাস্তা দেখিয়ে দিতে। কারণ সে চায় জাহান্নামে তার সঙ্গী বৃদ্ধি করতে। অল্প অল্প করে একসময় ঈমানটা ছোঁ মেরে নিতে সে বড়ই পারদর্শী। সে জানে কিভাবে ফাঁদ পাততে হয়, কীভাবে ঈমান চুরি করতে হয়। শয়তানের অজস্র ফাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক ফাঁদ অবিশ্বাস বা কুফর। অবিশ্বাসের বিষাক্ত তীর দিয়ে মানুষের ঈমানকে সে রক্তাক্ত করতে চায়, তার ইচ্ছা সুপ্ত ঈমানের বীজ চারা হয়ে ওঠার আগেই তাকে পায়ের তলে পিষে খতম করে দিতে। আর মূল তার লক্ষ্য তো এটাই যে সে ঈমানের উপর হামলে তাকে ছিন্নভিন্ন করবে বা তাকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। শয়তানের কাজে সহযোগিতার জন্য আছে তার অগণিত সঙ্গী, জীন ও মানুষ সাথী। কারণ শয়তান জানে ঈমান এমন এক সম্পদ যার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হতে পারে না, তার খুব ভালো জানা আছে ঈমান একসময় না একসময় মানুষকে চিরন্তন সাফল্যের পথ দেখাবে, আর এটাও সে জানে এই ঈমান না থাকাই মানুষকে চিরন্তন ব্যর্থতার পথের সন্ধান দিবে। আর তাই শয়তানের মূল লক্ষ্য সেই ঈমান, সেই বিশ্বাস। বিশ্বাস নষ্ট

Scanned by CamScanner

হওয়া মানে মানুষের অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়ে যাওয়া। বিশ্বাস নষ্ট করা মানুষকে হত্যা করার চাইতেও ভয়ানক, কেননা শারিরীক মৃত্যু যতটা না যন্ত্রণার তার চাইতে ঢের যন্ত্রণার যখন বিশ্বাসে ঘুন ধরে, বিশ্বাস যখন গলতে শুরু করে, বিশ্বাস যখন বন্ধ্যা হয়ে যায়। এখানে বিশ্বাস মানে ঈমান। বিশুদ্ধ ঈমান। যেই ঈমানের কারণেই মানুষের অস্তিত্বের সূত্রপাত, আর তার সাফল্যের পূর্ণতা।

আল্লাহর শোকর যে তিনি তাঁর রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমে আমাদেরকে ঈমান ও কুফর, বিভ্রান্তি ও হেদায়াতের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমরা পথভ্রষ্ট না হই। কিন্তু দুর্বল মানুষ হিসেবে আমাদের ত্রুটি হয়ে যায়, আমরা এই পার্থক্য বেমালুম ভুলে যাই। শয়তানের প্ররোচনায় বা নিজেদের দুর্বলতার কারণে ভুল করে বসি। কখনো কখনো আলেয়াতে আলো খোঁজার বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই, মরীচিকার দিকে পানির আশায় হাত বাড়াই, আর কুফর-অবিশ্বাসকে বিশ্বাস-ঈমানের নামে আত্মস্থ করি। মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় সমস্যা তো এটাই যে তাঁরা ঈমানকে চেনে না আর তাই আজকে তাঁদের অগোচরে শয়তানের সাথীরা তাঁদের ঈমান নিয়ে খেলা করতে পারছে। কিছু পরিভাষা, দুনিয়াবী উন্নতি আর বুদ্ধিবৃত্তিকতার নামে দোলনা থেকে শুরু করে কবর পর্যন্ত কুফরের জাল বুনে রেখেছে। এমন কোনো ক্ষেত্র বাকী নেই যেখানে শয়তানের বদনজর পড়েনি, যা তার নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়নি। খোকাখুকিদের পড়ার বই, হট্টগোল ভরা বাজার, সুউচ্চ ইমারতের চূড়া, অর্থনীতির লেনদেন, সামাজিক আচরণ, কোথায় না শয়তান তার অভিশাপময় উপস্থিতি দিয়ে মলিন করেনি? মুসলিমদের ছেলেভোলানো খেলনা দিয়ে ব্যস্ত রেখে তলে তলে শয়তানের সাথীরা তাদের ইচ্ছাপূরণ করছে। শয়তান আর তার সাথীদের ইচ্ছাতো জানাই আছে, ঈমানকে ধ্বংস করা, হককে দমিয়ে রাখার চেষ্টা। তবে মুসলিমরা তাদের ঈমানকে চিনতে শুরু করলেই শুরু হবে শয়তানের ধ্বংসলীলা, মুসলিমরা শয়তানের সাথীদের পরিভাষা, উন্নতি, স্বাধীনতা আর বুদ্ধিবৃত্তিকতার ঘোর থেকে জেগে উঠলেই তবে দেখা যাবে এই জাল আসলে মাকড়সার, যা স্বভাবগতভাবেই দুর্বল।

বিশ্বাস প্রতিটি মানুষেরই অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। বিশ্বাস ছাড়া কোনো সুস্থ মানুষই পাওয়া যাবে না। অনেক মানুষ, হরেক রকম বিশ্বাস। কিন্তু সকল বিশ্বাসই সঠিক বিশ্বাস নয়, হতে পারে না। কেবলমাত্র একটি বিশ্বাসই শাশ্বত ও নির্ভুল হতে পারে। এক শাশ্বত, সঠিক ও নিখাঁদ বিশ্বাসের স্বচ্ছ জলধারা আজ ছায়াচ্ছন্ন অজস্র অবিশ্বাসের কালো আঁধারে। ফলে সেই বিশুদ্ধ জলধারাকে আজ দেখতে হচ্ছে অবিশ্বাসের রঙে, ঢঙে। ছদ্মবেশে হরেক রকম বিশ্বাস নামের কু-বিশ্বাসে বিশ্বাসের গতর জড়িয়ে আছে। বিশ্বাসের চারার সাথে লেপ্টে আছে কিছু অবিশ্বাসের আগাছা।

Scanned by CamScanner

সেই নিখাঁদ বিশ্বাসের স্বচ্ছ প্রস্রবণ থেকে অবিশ্বাসের অপছায়াগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার একটি ছোট্ট প্রয়াস '***অবিশ্বাসের বিভ্রাট***'। বিশ্বাস শরীরের রক্তের মত, রক্ত মানুষের প্রাণ সচল রাখে, সেই রক্তের সাথে যখন বিষাক্ত পদার্থ মিলিত হয়ে যায় তখন রক্তকে শুদ্ধ করা জরুরী হয়ে পড়ে, তা না হলে মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পতিত হয়। রক্তকে বিশুদ্ধ করতে হলে রক্তের সাথে বয়ে বেড়ানো দূষিত পদার্থকে বের করে দিতে হয়। একইভাবে বিশ্বাসকে খাঁটি করতে হলেও বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস নাম নিয়ে ঘাপটি মেরে থাকা মলিন অবিশ্বাসগুলোও চিনে নিতে হবে। যাতে করে শ্বাশ্বত বিশ্বাসের বিমল জলধারা থেকে সকল অবিশ্বাসের আবাস দূর হয়ে যায়, কোনো মুখোশধারী আগাছা এগিয়ে এসে বিশ্বাসকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে না পারে, বিশ্বাস যেন তার অমলিন, নির্মল আর পরিশ্রুত রুপে ফিরে আসতে পারে। যেই বিশ্বাস মানুষের মুক্তির একমাত্র রাজপথ। আজ বিশ্বাসের সেই আগাছাগুলোকে চিনে দেওয়াই আমাদের ইচ্ছা ও লক্ষ্য।

আমি চেষ্টা করেছি এই কাজের সাথে যুক্ত থেকে বারাকাহ ও সাআদাহ হাসিল করার জন্যে। চেষ্টা তো মানুষ করেই, কিন্তু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াও দুর্বল মানুষের অক্ষমতারই লক্ষণ। সেই হিসেবে আমার কাজেও ভুল থাকতে পারে। তবুও আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহ এই কাজের সাথে আমাকে জড়িত রেখে আমাকে লেখকদের সাথে কিছু সাওয়াব অর্জন করার সুযোগ দান করেছেন। দুয়া থাকবে রাব্বুল আলামীন যেন এই কাজকে কবুল করে নেন, এর লেখকবৃন্দকে ক্ষমা করে তাদের কাজকে কবুল করেন, প্রকাশককে ও এর সাথে সম্পর্কিত সকলকে আল্লাহ কবুল ফরমান। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

দুয়ার মুহতাজ

মুহাম্মাদ শাকিল হুসাইন

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

বিষয়সূচী

১ম অধ্যায়

সংশয়পথ / ১৪

২য় অধ্যায়

স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং কিছু বিভ্রান্তির অবসান / ৩৪

৩য় অধ্যায়

বিবর্তন বনাম স্রষ্টা ? / ৪০

৪র্থ অধ্যায়

পুঁজিবাদের কালিমা / ৪৬

৫ম অধ্যায়

পুঁজিবাদ, সমতা ও সমধিকার / ৫৪

৬ষ্ঠ অধ্যায়

হিউম্যানিজম ও স্বাধীনতার যথেচ্ছা ব্যবহার / ৬০

৭ম অধ্যায়

প্রাচ্যবাদী চশমা / ৬৪

৮ম অধ্যায়

আলেয়ার আলো / ৭৮

৯ম অধ্যায়

স্বর্গের দিন স্বর্গের রাত! / ৮৬

Scanned by CamScanner

১০ম অধ্যায়

ইসলামে কি আদৌ ধর্ষণের শাস্তি বলে কিছু আছে? / ৯৬

১১তম অধ্যায়

সাহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রা) এর মুসহাফে দুটি অতিরিক্ত সুরা ছিলো কি? / ১০৪

১২তম অধ্যায়

সাত হারফ কি কুরআনের একাধিক ভার্সন? / ১১২

১৩তম অধ্যায়

মুসলিমরা দলে দলে বিভক্ত, তাহলে ইসলাম কীভাবে সত্য ধর্ম হয়? / ১২৬

১৪তম অধ্যায়

ফিরে তাকাও ১৩৬

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

১ম অধ্যায়

সংশয়পথ

আসিফ আদনান

যা থাকছে-

- মুসলিমদের মাঝে সংশয়ের কারন
- সংশয় উত্তরনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা
- সংশয় নিরসনে কর্তব্য

Scanned by CamScanner

"দেশে দেশে কাফিরদের সদম্ভ পদচারণা তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। সামান্য ভোগ, তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস, আর তা কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!" (আল কোরআন ৩: ১৯৬-১৯৭)

সম্প্রতি অ্যামেরিকা-বেইসড ইয়াক্বিন ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক রিসার্চ – Yaqeen Institute of Islamic Research (উমার সুলাইমান, জনাথন ব্রাউন) কোন কোন ফ্যাক্টরগুলোর কারণে অ্যামেরিকান মুসলিমরা ইসলামের ব্যাপারে সংশয়ে পড়ে যান তা নিয়ে একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেছে। What Causes Muslims To Doubt Islam : A Quantitative Analysis নামের ২৪ পেইজে একটি রিপোর্টে জরিপের ফলাফলগুলো তুলে ধরেছেন ইউসুফ শুহুদ। ২০১৬ সালে একই লেখক Modern Pathways To Doubt In Islam নামে একই ধরণের আরেকটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। দুটো লেখার শিরোনামে Doubt বা সংশয় শব্দটি ব্যবহার করা হলেও, এখানে Doubt শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হল **রিদ্দাহ** বা **Apostasy (ধর্মত্যাগ)**.

লেখা দুটো থেকে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন এবং উপসংহার পাওয়া যায়, যেগুলো পশ্চিমা মুসলিমদের পাশাপাশি আমাদের সমাজের অনেকের সংশয়ের মনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। একইসাথে পশ্চিমা বিশ্বে বর্তমানে যে ধরণের "ইসলাম" প্রচার করা হয়, এবং বর্তমানে যা বাংলাদেশেও চলছে, সেই "মডারেট সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম" কেন সার্বিকভাবে দীর্ঘমেয়াদে এ ধরণের সংশয়ের মোকাবেলায় ব্যর্থ হবে সেটা বোঝার জন্যও ইন শা আল্লাহ এ জরিপ থেকে উঠে আসা কিছু তথ্যের বিশ্লেষণ কার্যকরী হবে।

সংশয়ের উৎস

কোন কোন কারণে অ্যামেরিকান মুসলিমরা ইসলামের ব্যাপারে সংশয়ে পড়ে যান?

Scanned by CamScanner

কোন বিষয়গুলো তাদের সংশয়ের উৎস কিংবা ট্রিগার হিসেবে কাজ করে? ৬০০ জনের ওপর চালানো জরিপে ১৩টি কারণের কথা উঠে এসেছে।

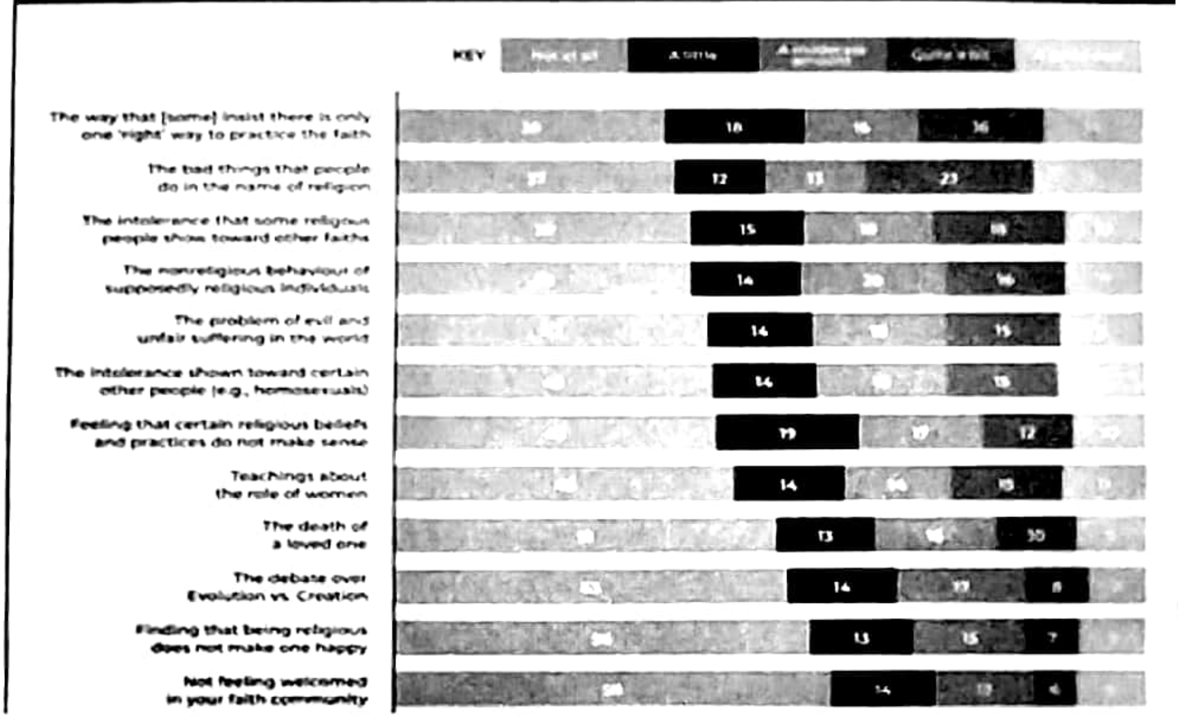

Figure 1: The Actions of Muslims, Rather than the Doctrines of Islam, are the Primary Drivers of Doubt Over Time

Primary Drivers Over Time

১) ইসলাম পালন করার একটাই মাত্র সঠিক পদ্ধতি আছে অনেকের এমন দাবি – ৬৪%

(এখানে ফিকহি মতপার্থক্যের কথা বলা হচ্ছে না। পরে বিষয়টি ইন্ শা আল্লাহ আরো পরিস্কার হবে)

২) ধর্মের নামে অনেক মানুষ যেসব অন্যায় করে – ৬৩%

৩) অন্যান্য ধর্মের প্রতি অনেক ধার্মিক মুসলিমদের অসহিষ্ণুতা – ৬১%

(অর্থাৎ জরিপে অংশগ্রহণ করা ৬১% এর মতে আল ওয়ালা ওয়াল বারা, ইসলাম নিয়ে সংশয় ও রিদ্দার কারণ)

৪) আপাতভাবে ধার্মিক এমন ব্যক্তিদের অনৈসলামি কার্যকলাপ – ৬১%

৫) The Problem Of Evil – ৫৮%

(The Problem Of Evil: "আল্লাহ যদি পরম করুণাময় হন, কল্যাণময় হন, ন্যায়বিচারক হন তাহলে পৃথিবীতে এতো দুঃখ-দুর্দশা কেন? কেন এত নিরীহ মানুষ এতো নির্যাতন, কষ্টের মধ্যে দিয়ে যায়?")

৬) কিছু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষের প্রতি অসহিষ্ণুতা (যেমন সমকামিদের প্রতি) – ৫৮%

৭) কিছু বিশ্বাস ও ইবাদত যৌক্তিক না মনে হওয়া, অর্থহীন মনে হওয়া – ৫৭%

Scanned by CamScanner

৮) নারীর ভূমিকার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা – ৫৫%

৯) প্রিয়জনের মৃত্যু – ৪৯%

১০) বিবর্তনবাদ নিয়ে বিতর্ক – ৫৩%

১১) আবিষ্কার করা যে ধর্ম পালন করে সুখ (happiness) পাওয়া যায় না – ৪৪%

১২) অন্যান্য মুসলিমদের মাঝে নিজেকে অবাঞ্চিত মনে হওয়া – ৪২%

১৩) স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ – ৩৮%

এছাড়া ফলোআপ প্রশ্নের ভিত্তিতে দ্বিতীয় আরেকটি টেবিল করা হয়েছে, যেখানে আগের ফলাফলগুলোই একটু ভিন্ন ক্রমধারায় এসেছে।

Figure 2: Terrorism and Suffering Are Likely Influencing Current Levels of Doubt

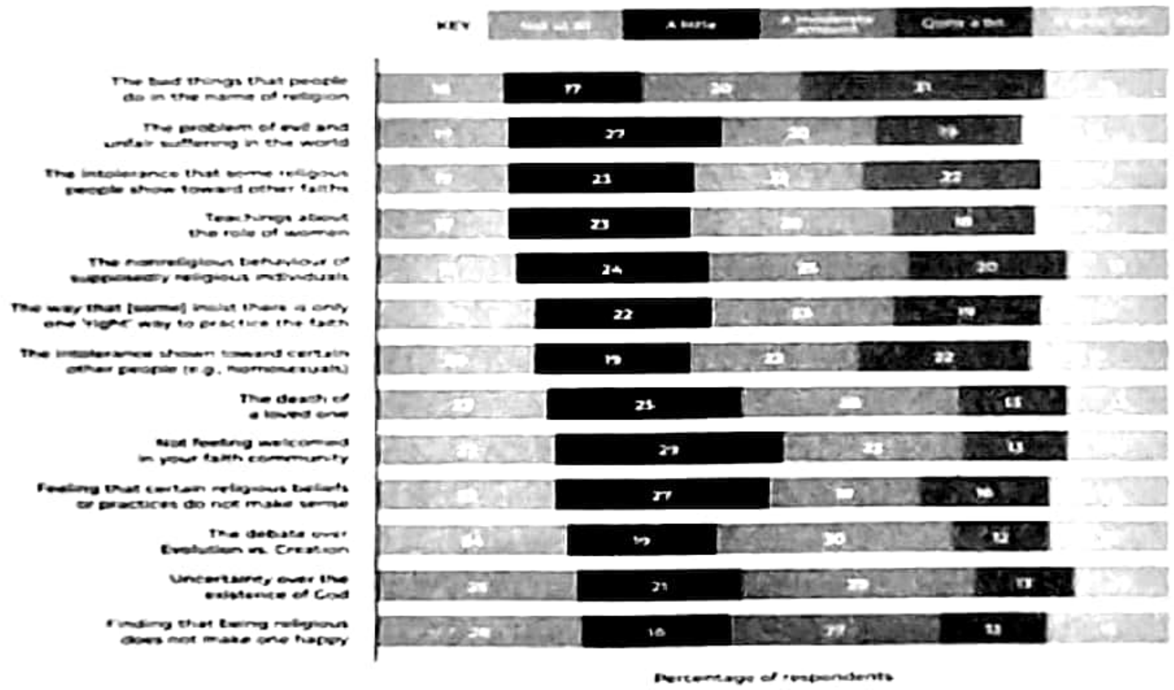

Factors influencing current levels of doubt

এখানে যেসব কারণ উঠে এসেছে সেগুলোকে মোটামুটি তিনভাবে ভাগ করা যায়।

- *দর্শন ও বিজ্ঞান*
- *নৈতিকতাসংক্রান্ত ও সামাজিক বিষয়*
- *ব্যক্তিগত*

দর্শন ও বিজ্ঞান

দেখা যাচ্ছে, আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কে সবচেয়ে বেশি আলোচিত দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর বদলে, নৈতিকতাসংক্রান্ত ও সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে বেশি

Scanned by CamScanner

সংশয় তৈরি হচ্ছে। উল্লেখিত ১৩টি উৎসের মধ্যে ১০ ও ১৩ নম্বরে বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ের কথা এসেছে। ৭ নম্বরে এসেছে কিছু বিশ্বাস ও ইবাদত "অর্থহীন" মনে হবার বিষয়টি। তবে এই "অর্থহীন" মনে হবার ব্যাপারটি পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞানসংশিষ্ট বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয় না। ৫ নম্বরে এসেছে Problem of Evil এর কথা। সুতরাং নাস্তিকরা যেগুলোকে তাদের সবচেয়ে জোরালো যুক্তি মনে করছে, সেগুলো আসলে ততটা কার্যকরী না। "কুরআনের অমুক আয়াত অবৈজ্ঞানিক, বুখারির এত নাম্বার হাদিসের কথা সঠিক না" – নাস্তিকদের এ ধরনের কথাবার্তা, এই জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, মুসলিমদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর না।

নৈতিকতাসংক্রান্ত ও সামাজিক বিষয়

অন্যদিকে, নৈতিকতাসংক্রান্ত ও সামাজিক এমন কিছু ইস্যুতে মুসলিমদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে যা অবাক করার মতো। এই ইস্যুগুলো কেমন?

Modern Pathways To Doubt থেকে কিছু উদাহরণ দেখা যাক –

ইসলামী শারীয়াহ অনুযায়ী নারীর ভূমিকা - একজন মা তার ছেলে ও মেয়ে সন্তানদের সাথে একইরকম আচরণ করতেন না। বড় ভাই যা ইচ্ছে করতে পারতো মা কিছুই বলত না,কিন্তু ছোট বোনের জন্য ছিলো অনেক নিষেধ, অনেক মানা, অনেক নিয়মনীতি...একারণে পরবর্তীতে সেই মহিলার মনে ইসলাম নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সে ইসলাম ত্যাগ করে সংশয়বাদী (Agnostic) হয়ে যায়।

যিনা - অ্যামেরিকার ডেইটিং কালচার এবং বিয়ের আগে যৌনতার ব্যাপারে অ্যামেরিকার সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক মুসলিম হতাশায় ভুগতে থাকে। কারণ ইসলাম বিয়ের আগে যৌনতা এবং নারীপুরুষের সম্পর্কের বৈধতা দেয় না। মানসিক যাতনা কাটাতে আবির্ভাব ঘটে সংশয়ের। যারা ডেইট করে, যারা বিয়ের আগে যৌনতায় লিপ্ত হয়েছে বা হচ্ছে, **ইসলামকে সত্য হিসেবে মেনে নেয়া তাদের জন্য তেমন একটা লাভজনক না। তারা চায় ইসলাম সত্য না হোক, কারণ তাহলে আর নিজেরদেরকে নিয়ে অনুতপ্ত হতে হবে না।**

সমকামিতা - নিজেকে মুসলিম দাবি করা কিন্তু ইসলাম নিয়ে বড় ধরণের সংশয়ে ভোগা (!) একজন নারীর জন্য সমস্যাটা হল সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। "'যাদের জন্মই হয়েছে' সমকামি হিসেবে কীভাবে আল্লাহ তাদের জন্য এমন নিয়ম ঠিক করে দেন যাতে করে তাদের সামনে কেবল দুটো পথ খোলা থাকে,

Scanned by CamScanner

সারা জীবন নিজের যৌনকামনাকে চেপে রাখা, অথবা ইসলাম ত্যাগ করা" - মহিলার প্রশ্ন। *এই মহিলা সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান তার নিজের "অন্তর্নিহিত নৈতিকতা আর ইনসাফের" ধারণার সাথে মেলাতে পারেন না।*

আ'ইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা – অ্যামেরিকান মুসলিমদের অনেকেই আ'ইশার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সাথে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিয়েকে প্রবলেম্যাটিক মনে করে। ইসলামবিদ্বেষীদের প্রিয় এ টপিক অ্যামেরিকান মুসলিমদের অনেকের মনেই সংশয় তৈরি করে।

জিহাদ – সন্ত্রাসবাদ নিয়ে চালানো মিডিয়া প্রোপাগ্যান্ডা, এবং লিবারেলিজম ও সেক্যুলার হিউম্যানিজমের চশমা দিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে দেখলে অনেক মুসলিমই সংশয়ে পড়ে যায়, "ইসলাম কি আসলেই অসহিষ্ণু?" ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তারা যখন দেখে জিহাদ সবসময় ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, তাদের সংশয় আরো বেড়ে যায়। "ইসলাম শান্তির ধর্ম", এ কথা আর কাজে আসে না

ইসলাম পালন করার সঠিক পদ্ধতি একটাই – জরিপ অনুযায়ী ইসলাম নিয়ে সংশয় সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ হল, 'ইসলাম পালনের সঠিক পদ্ধতি একটাই', অনেক মুসলিমের এমন দাবি। আমরা জানি যে, ফিকহি বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য জায়েয, এবং এটা ইসলামের একটা সৌন্দর্য। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলাম পালনের সঠিক পদ্ধতি একটাই, এমন বলা ভুল। নামাযে হাত রাখার জায়গা কেবল একটাই, জামাতে নামায পড়ার সময় সূরা ফাতিহার পর আমীন বলার ব্যাপারে সঠিক অবস্থান একটাই, এমন বলা হলে সেটা অবশ্যই ভুল। কিন্তু একটু আগে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে, যেমন ইসলামী শারীয়াহ অনুযায়ী নারীর অবস্থান, যিনা, সমকামিতা ইত্যাদি বিষয়ে, ইসলামের অপরিবর্তিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একথা সম্পূর্ণ সঠিক যে ইসলাম পালনের সঠিক পদ্ধতি একটাই। আলোচ্য জরিপে এ দ্বিতীয় অর্থটাই এসেছে। জরিপে অংশগ্রহনকারীদের সামনে যেসব প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছিলো সেগুলো দেখলে বোঝা যায়, এখানে ফিকহি মতপার্থক্যকে বোঝানো হচ্ছে না। যেমন –

- *"বিয়ে আর জানাযা বাদ দিলে আপনি কতোটা নিয়মিত মসজিদে যান?"*
- *"সাধারণত আপনি কতোটা নিয়মিত নামায পড়েন?"*
- *"কুরআনের ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন -*

ক) কুরআন আল্লাহর কালাম, এবং একে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে?

খ) কুরআন আল্লাহর কালাম কিন্তু এতে এমন অনেক কিছু আছে যা কেবল রূপক

গ) কুরআন মানুষের লেখা ইতিহাস ও নৈতিকতা সংক্রান্ত একটি প্রাচীন বই"

Scanned by CamScanner

- *"নিচের কথাগুলোর ব্যাপারে আপনার মত কী?*

-পৃথিবীতে দু ধরণের মানুষ আছে। একদল সত্যের পক্ষে আরেকদল সত্যের বিপক্ষে

-সমকামি যৌনসম্পর্ক ও বিয়ে

-সুদি ব্যাংক লোন

-অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব পালন করা

-অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করা

-মাথা না ঢেকে নারীদের বাইরে যাওয়া

-নারী ও পুরুষ মুসল্লিদের জন্য নারী ইমাম

- গর্ভের সন্তানের কারণে মায়ের স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই, এমন ক্ষেত্রে গর্ভপাত"

সহজেই বোঝা যাচ্ছে, এখানে নিছক মাসআলা-মাসায়েলগত মতপার্থক্যের সাথে সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন উপস্থাপন করা হচ্ছে না। এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে যেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান পরিস্কার। যেগুলো স্পষ্ট হারাম এবং অনেক সময় কুফরের সাথে সম্পর্কিত। সমকামিতা, ইসলামী শারীয়াহ অনুযায়ী নারীর ভূমিকা, হিজাব, নারী ইমাম হতে পারবে কি না, যিনা (বিয়ের আগে যৌনতা), রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিয়ে, আল্লাহর হুকুম ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের "ট্র্যাডিশানাল অবস্থান" (পড়ুন কুরআন ও সুন্নাহর অবস্থান, সালাফ আস-সালেহিনের অবস্থান, সঠিক অবস্থান) অ্যামেরিকান মুসলিমরা মেনে নিতে পারছে না। খোদ ইসলাম তাদের জন্য ইসলাম নিয়ে সংশয়ের উৎস হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইসলামের নৈতিকতা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। তারা এতোটাই "নৈতিক" হয়ে গেছে, এসব ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান তাদের কাছে যথেষ্ট "নৈতিক" মনে হচ্ছে না। সহজ ভাষায় দীর্ঘসময় ধরে পশ্চিমা নৈতিকতা ও দর্শন (সেক্যুলারিজম ও লিবারেলিজম) দ্বারা চালিত সমাজের মধ্যে থাকার কারণে, এবং এ পশ্চিমা ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ না করার কারণে পশ্চিমা নৈতিকতাকেই এরা নিজেদের কম্পাস হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। যখন ইসলামের অবস্থান এই পশ্চিমা কাঠামোর সাথে মিলছে না, তখন তারা ইসলাম নিয়ে সংশয়ে পড়ে যাচ্ছে। তারা এমন এক ইসলাম চাচ্ছে যেটা পশ্চিমা কাঠামোর সাথে খাপ খায়। যখন ইসলামের কোনো বিধান এই পশ্চিমা নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে, তখন তারা নতুনভাবে ইসলামকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। আর যখন কেউ বলছে, "না ইসলামে সমকামিতা হারাম, সুদ হারাম, হিজাব ফরয, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবমাননাকারীর শাস্তি মৃত্যু, জিহাদ ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের ফরয বিধান, কেবল এককালীন না" –

Scanned by CamScanner

তখন সেটা তাদের জন্য "সংশয়ের উৎস" হয়ে যাচ্ছে। তারা ইসলাম ত্যাগ করছে।

ব্যক্তিগত

এছাড়া সংশয়ের উৎস হিসেবে ব্যক্তিগত শোকের কথাও জরিপে এসেছে। প্রিয়জনের মৃত্যুর পর শোকার্ত ব্যক্তি তাক্বদির নিয়ে সংশয়ে পড়েছে এমন উদাহরণ অনেক। আমাদের সমাজেও এমনটা দেখা যায়। তবে সংশয়ে পড়ার আরেকটি কারণ অবাক করার মতো। অ্যামেরিকান মুসলিমদের মধ্যে অনেকে সংশয়ে পড়ে যাচ্ছে কারণ তারা আবিস্কার করছে যে ধর্ম পালন করে সুখ (happiness) পাওয়া যায় না। এ জরিপ অনুযায়ী অ্যামেরিকান মুসলিমদের কাছে আল্লাহ্ আছেন কি না, এ প্রশ্নের চেয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে সুখ পাওয়া যাবে কি না – এ প্রশ্ন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। একজন অংশগ্রহনকারীর ভাষায় –

সোশাল মিডিয়া আর তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি (Instant Gratification) পাবার এ যুগে স্রষ্টার অস্তিত্বের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল –

আমার কি স্রষ্টার দরকার আছে?

ইসলাম আমাকে এমন কী দেবে যা অন্য জায়গায় পাবো না?

ইসলাম কি আমাকে সুখী জীবন দেবে?

পর্যবেক্ষণ

এ জরিপ দুটো থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো পয়েন্ট হল,

- বিজ্ঞান বা দর্শন না, আধুনিক সময়ে ইসলাম নিয়ে সংশয়ের মূল কারণ হল বিদ্যমান সামাজিক নৈতিকতার কাঠামোর সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিক অবস্থান।

- আধুনিক পশ্চিমা চিন্তা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত মানুষ পশ্চিমা কাঠামো অনুযায়ী ইসলামের অপরিবর্তনীয় বিভিন্ন বিষয়কে নতুন করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। না পারলে বা বিরোধিতার সম্মুখীন হলে ইসলাম ত্যাগ করছে।

যদিও এ জরিপ কেবল ৬০০ জন মানুষের ওপর চালানো, এবং এ থেকে পাওয়া ফলাফল ঢালাওভাবে এক্সট্রাপোলেট করা সম্ভব না, তবে আমি মনে করি মোটা দাগে এ ফলাফলগুলো বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রেও ভিন্ন মাত্রায় প্রযোজ্য। কারণ মিডিয়া, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক চাপ (Peer Pressure), সেক্যুলার-লিবারেল চিন্তাধারার মতো ফ্যাক্টরগুলো আমাদের সমাজেও উপস্থিত। যারা যত বেশি

Scanned by CamScanner

পশ্চিমা মিডিয়া ও ন্যারেটিভের প্রতি উন্মুক্ত হবে, অথবা বাংলাদেশের “প্রগতিশীল সুশীলসমাজ” দ্বারা প্রভাবিত হবে - তাদের ক্ষেত্রে ফলাফল ততোবেশি অ্যামেরিকান সমাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবার সম্ভাবনা বাড়বে।

এর কারণ হল পশ্চিমা সমাজ (এবং তাদের বাজে ফটোকপি দেশীয় সুশীল-প্রগতিশীল সমাজ) মুখে বহু মতের সহাবস্থান এবং মোরাল রেলেটেভিযমের (ভালোমন্দ সব কিছুই আপেক্ষিক। কোনো কিছুই পরম বিচারে খারাপ না। কোন কিছু পরম বিচারে ভালো ও না।) কথা বললেও আদতে তারা নিজেদের দর্শন ও নৈতিকতাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস কাজ করে যে, তারা নৈতিকভাবে সারা বিশ্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর তাদের নৈতিকতা ও দর্শন হলো লিবারেলিযম ও সেক্যুলার হিউম্যানিযম, যা ইসলামের সাথে আগাগোড়া সাংঘর্ষিক। স্বাভাবিকভাবেই এই নৈতিকতার মাপকাঠিতে বিচার করলে ইসলামের অনেক অনেক কিছুই অনৈতিক, অমানবিক, হিংসাপূর্ণ।

এটা হলো সেই নৈতিকতা যেটা সমকামিতা, যিনা, অবাধ যৌনতা, সুদ, শিরক, কুফর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবমাননাসহ সকল ধরণের নোংরা আবর্জনার বৈধতা দেয়। এটা হলো সেই নৈতিকতা যেটা “ইয়াযিদি মেয়েদের বাঁচাতে” ইরাকে শহরের পর শহর ধ্বংস করে ফেলে, হাজার হাজার মানুষকে কার্পেট বম্বিং করে হত্যা করে, কিন্তু যখন তাদের সগোত্রের ত্রানকর্মীরা ক্ষুধার্থ নারী ও শিশুদের যৌন সংগমে বাধ্য করে তখন বিষয়টা চেপে যায়। এটা হল সেই নৈতিকতা যেটা নিজেদের আধুনিক হওয়া নিয়ে গর্ব করে, “পশ্চাৎপদ” বিভিন্ন সমাজকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।

কিন্তু গতকালের ঔপনিবেশিক লুটপাট, ধর্ষণ আর অত্যাচারের ভিত্তির ওপর যে তাদের বর্তমান দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ভুলে যায়। এ নৈতিকতা ও দর্শন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়াই স্বাভাবিক। যখন মুসলিমরা দীর্ঘসময় ধরে এমন আদর্শ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত সমাজে বসবাস করে, অথবা এমন আদর্শের প্রতি উন্মুক্ত হয় - ক্রমাগত মিডিয়া, আড্ডা, আলোচনা, বিতর্কে এসব ধ্যানধারণার পুনরাবৃত্তি শুনতে থাকে – যখন তাদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে অজ্ঞতা ও হীনমন্যতা কাজ করে - এবং যখন তারা এগুলোকে গ্রহণ করতে শুরু করে – তখন অবধারিতভাবেই তার চিন্তার জগতে দুটো বিপরীতমুখী আদর্শের সংঘর্ষ ঘটে। আর কুফর দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সংঘর্ষের কী ফলাফল আসতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। টিভি, সিনেমা, গান, গল্পের মাধ্যমে ক্রমাগত কিছু অনৈতিক ও অস্বাভাবিক বিষয়কে আমাদের সামনে “স্বাভাবিক” হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যেমন ৯০ এর দশকে জন্মানো প্রজন্মের

Scanned by CamScanner

চেয়ে, নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকে জন্ম নেয়া বাংলাদেশীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সমকামিতা ও বিয়ে-বহির্ভূত যৌনতার মতো বিষয়গুলোর গ্রহনযোগ্যতা বেশি।

প্রথম প্রথম ধাক্কা লাগলেও একসময় আমাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সয়ে যাচ্ছে। এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম আসছে। পরবর্তী প্রজন্ম অস্বাভাবিককেই "স্বাভাবিক" হিসেবে বিশ্বাস করছে। এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মূল্যবোধ আর নৈতিকতার মাপকাঠি বদলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা যে সবসময় স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে ঘটছে, তা না। যেহেতু কিশোর-তরুণদের ইসলামের ব্যাপারে জানার ব্যাপারে বিশাল গ্যাপ থেকে যাচ্ছে, তাই তারা অজান্তেই পশ্চিমা চিন্তাকেই নিজেদের ডিফল্ট দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করছে। বিজ্ঞান ও দর্শন সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর চেয়ে মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক আচরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বেশি জীবনঘনিষ্ঠ। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব-তর্ক সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে না। বিশেষ করে আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কে কোন উপসংহারে পৌছানোর ক্ষেত্রে এসব বিমূর্ত বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা থেকে নিশ্চিত কোনো ফলাফল পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক আচরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো সরাসরি মানুষের ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে। যিনার ব্যাপারে আমার ধারণা কী, সেটা আমার আচরণকে প্রভাবিত করবে। মানবতাকে আমি কি ইসলামের অবস্থান থেকে দেখবো নাকি সেক্যুলার হিউম্যানিযমের অবস্থান থেকে দেখবো, সেটা শারীয়াহ নির্ধারিত শাস্তির (হুদুদ) ব্যাপারে আমরা চিন্তাকে প্রভাবিত করবে। নৈতিকতার শিক্ষা আমি মিডিয়া কিংবা অধিকাংশ মানুষ কী বলে, সেখান থেকে নেবো নাকি কুরআন-সুন্নাহ থেকে নেবো, সেটা ইসলামের ব্যাপারে আমার মনোভাবকে প্রভাবিত করবে। এ কারণে সংশয় থেকে মুসলিমদের রক্ষার জন্য বিজ্ঞান ও দর্শনসংক্রান্ত আলোচনার বদলে নৈতিকতাসংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর আলোচনাই বেশি গুরুত্বপূর্ন। যেমন কুরআনে অবৈজ্ঞানিক আয়াত আছে কি না, এর চেয়ে নারীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থানই নৈতিক – এ আলোচনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দেয়া কিংবা তাদের সাথে তর্ক করার চেয়ে সেক্যুলার হিউম্যানিযম, লিবারেলিযম এবং পশ্চিমের বর্তমান ও অতীত ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন তোলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনায় বিবর্তনবাদকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।

সংশয় নিরসনে "মডারেট/অ্যামেরিকান/পশ্চিমা ইসলামের" পদ্ধতিগত ব্যর্থতা

একটু খেয়াল করলেই স্পষ্ট হবার কথা জরিপে সংশয়ের উৎস হিসেবে উঠে আসা

Scanned by CamScanner

বিষয়গুলোর অধিকাংশেরই সম্পর্ক ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের সাথে। ধরুন আপনি বাংলাদেশের দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের কোন একটার সদস্য বা সমর্থককে বলেন – "তোমার দল অমুক অমুক অপরাধের সাথে জড়িত। এটা একটা সন্ত্রাসী দল। এ আদর্শ বিষাক্ত"। আপনার কি মনে হয় একজন, এক লক্ষ বা এক কোটি বার এই কথা বলতে থাকলে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী তার আদর্শ ত্যাগ করবে? বাস্তবতা উল্টো সাক্ষ্য দেয়। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদসহ বিভিন্ন ধরণের আদর্শের লোকজন নিজ আদর্শের কিছুসংখ্যক মানুষের কাজের ওপর ভিত্তি করে নিজ আদর্শ ত্যাগ করে না। অথচ চিরন্তন সত্যকে কেবল মিডিয়ার একপেশে ও বিকৃত প্রোপাগ্যান্ডার ওপর ভিত্তি করে মানুষ ত্যাগ করছে।

দূষিত রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারীরা যতোটুকু দৃঢ়তা দেখাতে পারছে, ইসলামের অনুসারীরা সেটা পারছে না, কেন? একজন ব্যক্তি যদি আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল-কে সৃষ্টিজগতের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে স্বীকার করে নেয়, যদি মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করে, কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে স্বীকার করে, এবং ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হিসেবে বিশ্বাস করে – তাহলে কীভাবে সে আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে? আল্লাহর প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্তের চাইতে নিজের কিংবা সমাজের বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়?

মূল সমস্যাটা হল অজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং পারিপার্শ্বিক চাপ। মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে নিগূঢ় কোন প্রশ্নের তুলনায়, "পাছে লোকে কিছু বলে" – এই উৎকণ্ঠা আর স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়ার প্রবণতা এই মুসলিমদের সংশয়ের পেছনে বেশি ভূমিকা রাখছে। তাই এ সমস্যার সমাধান করতে হলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করতে হবে। পশ্চিমা মানদন্ড অনুযায়ী না, আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হিসেবে, আসমান ও যমিনের মালিকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ দিকনির্দেশনা হিসেবে, মানুষের ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি এই মুসলিমদের দায়িত্ব হল এমন পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসা যা ইসলামের মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও চেতনার পরিপন্থী। যদি আপনি প্রতিদিন এমন কোন আড্ডায় যান, যেখানে নিয়মিত সিগারেট খাওয়া হয়, তাহলে আপনার সিগারেট খাবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। যদি অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে চান তাহলে আপনার ফ্রি-মিক্সিং ও মিক্সড গ্যাদারিং এড়িয়ে চলতে হবে, এড়িয়ে চলতে হবে এমন সবকিছু যা আপনাকে এ ধরনের সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একইভাবে আপনাকে এমন সমাজ থেকে, এমন ভূমি থেকে বের হয়ে আসতে হবে যেখানে অবস্থান করা, আপনার অথবা আপনার পরিবারের কোন সদস্যের ঈমানকে হুমকির মুখে ফেলে।

Scanned by CamScanner

যদিও ইয়াক্বিন ইন্সটিটিউটের রিপোর্টে বলা হয়েছে - the overwhelming majority of Islamic doctrine and practice is wholly compatible with living as an American citizen – কিন্তু বাস্তবতা হল অ্যামেরিকার নাগরিক হিসেবে অবস্থান করা, অ্যামেরিকার মতো সমাজে অবস্থান করাই মুসলিমের ঈমানের জন্য ঝুঁকির কারণ। অ্যামেরিকান মুসলিমদের সংশয়ের পেছনে বড় একটা কারণ তাদের অ্যামেরিকাতে অবস্থান। আজকে যারা ইসলাম ত্যাগ করছে, তাদের অধিকাংশের পরিবারই এক বা দু প্রজন্ম আগে পশ্চিমে এসেছে। তাদের বাপ-দাদারা যখন অ্যামেরিকাতে ঢুকেছিলো তখন বেশিরভাগই দশজন মুসলিমের মতো বিশ্বাস ও চিন্তা নিয়েই ঢুকেছিল। হয়তো তাদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত আমলদার ছিলো। কিন্তু মাত্র এক/দুই প্রজন্মের ব্যবধানে অবস্থা পাল্টে গেছে। মুসলিম পরিবার থেকে মুরতাদ সন্তান, নাতিনাতনি বের হচ্ছে। এর পেছনে অ্যামেরিকার মতো একটি সমাজে অবস্থান করার ভূমিকাকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।

এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত এ খোঁড়া অজুহাত দেয়ার সুযোগ নেই যে, মুসলিম অধ্যুষিত ভূখন্ডগুলোতেও একই অবস্থা। কারণ বাস্তবতা। মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে ইসলামী শারীয়াহ নেই, শাসনের ক্ষেত্রে তাওহিদ নেই। তবুও এখনো পশ্চিমের সাথে এ ভূখন্ডগুলোর সমাজ-বাস্তবতার পার্থক্য আছে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে আস্তে আস্তে মুসলিম ভূখন্ডগুলোও একই পরিণতির দিকে আগাচ্ছে কিন্তু মুসলিম ভূখন্ডগুলোর সামাজিক-নৈতিক অবস্থার অবনতি ও অবক্ষয় এখনো অ্যামেরিকার মতো পর্যায়ে পৌছেনি (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)। অন্ধ, অজ্ঞ, বিভ্রান্ত বা আত্মপ্রতারণাকারী ছাড়া কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত করার কথা না।

ইন ফ্যাক্ট, কেন মুসলিমদের জন্য কাফিরদের ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করা বৈধ না, এ প্রশ্নের জবাবে আলিমগণ স্পেসিফিকালি ইসলামের প্রতি কমিটমেন্ট, নৈতিকতা, আচরণ এবং ঈমান নষ্ট হবার কথা বলেছেন।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ ইবন উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন –

> *"কাফির দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করা একজন মুসলিমের দ্বীনি দায়িত্ব, নৈতিকতা, আচরণ ও আদবের জন্য মারাত্মক হুমকি বহন করে। আমরা অনেকেই দেখেছি যারা এসব দেশে সেটেল হয়েছে তারা গোমরাহ হয়েছে, এবং পরিবর্তিত হয়ে ফিরে এসেছে। তারা ফাসিক-ফাজির হয়ে ফিরে এসেছে। অনেকে মুরতাদ হয়ে গেছে, এবং নিজের দ্বীনসহ সব ধর্মে অবিশ্বাসী হয়ে ফিরেছে। তারা দ্বীনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এবং দ্বীন ও এর অনুসারীদের; অতীত ও বর্তমান নিয়ে বিদ্রূপ করে। আমরা আল্লাহর কাছ আশ্রয় চাই।*

Scanned by CamScanner

কীভাবে একজন মুসলিম কাফিরদের ভূখন্ডে জীবন কাটানোর ব্যাপারে পরিতৃপ্ত হতে পারে, যেখানে প্রকাশ্যে কুফরের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, এবং আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আইন ব্যাতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা হয়? নিজ চোখে এসব দেখার পর, নিজ কানে এসব শোনার পর একসময় অন্তর এগুলোর অনুমোদন দেয়া শুরু করে, এমনকি ব্যক্তি মনে করতে শুরু করে যে সে এবং তার পরিবার আসলে ঐ মাটিতে থাকার জন্যই... অথচ সে, তার স্ত্রী এবং তাদের সন্তানেরা - তাদের দ্বীন এবং নৈতিকতা - চরম হুমকির সামনে।" [মাজমু' ফাতাওয়া আশ-শায়খ ইবন উসাইমিন, ফতোয়া নম্বর ৩৮৮]

শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলেছেন –

"আপনারও আর মনে রাখা উচিত যে লাভের আশায় ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে মূলধন সংরক্ষন উত্তম। মুসলিমের মূলধন হল তার দ্বীন। একজনের মুসলিমের উচিৎ না ক্ষণস্থায়ী কোন দুনিয়াবি প্রাপ্তির আশায় এ মূলধনকে হুমকিতে ফেলা...

আমরা পরামর্শ দেবো, কোন কাফির দেশে না যাবার এবং সেখানে সেটেল না হবার, ব্যতিক্রম হলো এমন পরিস্থিতি যেখানে আপনি বাধ্য সাময়িকভাবে সেখানে যাবার, যেমন এমন কোন চিকিৎসা নেয়ার জন্য, যা মুসলিম দেশগুলোতে পাওয়া যায় না।"
[Should he go back and live in a kaafir country? - https://islamqa.info/en/27211]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"যে কোনো মুশরিকের সাথে বসবাস করে এবং তাদের সাথে মেশে সে তারই মতো।" (আবু দাউদ)

এবং

"মুশরিকদের মধ্যে বসবাসরত প্রত্যেক মুসলিম থেকে আমি মুক্ত।" (আবু দাউদ)

মালিকুল মুলক আল্লাহ বলেছেন –

নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। [সূরা নিসা, ৯৭]

সমস্যার কারণ ও স্থায়ীকরণ স্পষ্ট। সমস্যা হল মডারেট ইসলামের প্রচারকরা এ সহজ সত্যকে স্বীকার করতে নারাজ। তারা প্রথমত পশ্চিমে অবস্থান করাকে সমস্যা মনে করেন না, বরং অনেকেই নানাভাবে এটাকে জায়েজ করা এমনকি ইবাদত বলে

Scanned by CamScanner

প্রমাণ করারও লজ্জাজনক চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তারা স্পষ্টভাবে, দৃঢ়তার সাথে ইসলামের অবস্থান, ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন না। তারা একটা অ্যাপলোজেটিক স্ট্যান্স নেন। লিবারেল-সেক্যুলার দর্শনের প্রতিরোধ না করে, খণ্ডন না করে, এগুলোর ঠিক করে দেয়া মাপকাঠি দিয়েই ইসলামকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তারা নানা বিচ্ছিন্ন মত খুজে বের করে করে, অ্যামেরিকা বা পশ্চিমের সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে না তারা সেক্যুলার-লিবারেল মানদন্ডে উত্তীর্ন হতে পারেন, না মুসলিমদের সংশয় দূর করতে পারেন, আর না ইসলামের অনুসরণ করতে পারেন।

এছাড়া এ ধরনের অ্যাপ্রোচ দীর্ঘমেয়াদে আরো বেশি ছাড়, আরো বেশি আপোষের দিকে তাদের নিয়ে যেতে বাধ্য। কারণ তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই কুফফারের দর্শন, নৈতিকতা ও সমাজের নীতি অনুযায়ী, ইসলামী শারীয়াহ অনুযায়ী না। তারা নিজেরাই নিজেদের এমন এক কোণার দিকে ঠেলে দিয়েছেন যেখানে ছাড়ের পর ছাড় দেয়া ছাড়া অবস্থান টিকিয়ে রাখার আর কোনো উপায় তাদের নেই। আর যত ছাড়ই তারা দিক না কেন কখনোই শেষরক্ষা হবে না। কারণ আল্লাহ 'আযযা ওয়া জালা আমাদের এ ধরণের পদ্ধতির অমোঘ পরিণতির কথা অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।

> *"আর ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত' আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।" [আল-বাক্বারা, ১২০]*

সুতরাং দুটো বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন -

১) পশ্চিমে অবস্থান করা এধরনের মডারেট স্কলার, দা'ঈ বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলম নেয়া, তাদের মত-অবস্থানের অনুসরণ করা সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলতে হবে। যেসব বিচ্ছিন্ন, অথবা নব-উদ্ভাবিত মত তারা দিচ্ছেন সেগুলো একটা অস্বাভাবিক ও প্রেশারাইযড সিচুয়েশান থেকে বলা। একদিকে অ্যামেরিকান/পশ্চিমা সরকারের চাপ, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের ইসলাম থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাওয়া, সংশয়, রিদ্দাহ - এ দু'য়ের মাঝে পড়ে তারা এধরনের অবস্থান নিচ্ছেন। তারা যেটাকে ইজতিহাদ হিসেবে উপস্থাপন করছে আসলে সেটা অসহায়ত্ব, ডেসপারেশান এবং কাপুরুষতা। সমকামিতা কিংবা এ জাতীয় বিষয়ে তারা আজ যেসব কথা বলছেন, মুসলিমরা বিজয়ী অবস্থান থাকলে তাদের কয়জন এধরণের কথা বলতেন?

Scanned by CamScanner

২) পশ্চিমা দর্শনের মোকাবেলায়, ইসলামের সমর্থনে কিংবা আস্তিক-নাস্তিক তর্কে তারা যে অ্যাপ্রোচ নিয়েছেন - বিজ্ঞান, মানবতা, অধিকার - ইত্যাদি দিয়ে ইসলামকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা যথাসম্ভব বাদ দিতে হবে। কারণ এটা একটা রেসিপি ফর ডিসাস্টার। সহজাতভাবেই একটা দুর্বল, রক্ষণাত্মক অবস্থান। এক সময় না এক সময়, মানুষের বানানো এসব ফ্রেইমওয়ার্কে ইসলাম আটকে যাবেই। তাই এই অ্যাপ্রোচ বাদ দিয়ে, ইসলামের অবস্থানের যৌক্তিকতা সহজবোধ্যভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা উচিত। অজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব দূর করা উচিত। এবং এসব ইস্যু নিয়ে সঠিক অবস্থান এবং তার পেছনের হিকমাহ, বাস্তবতার আলোকে তুলে ধরা উচিত। হিকমাহর সাথে দাওয়াহ করা উচিত, তবে হিকমাহর অর্থ ছাড় দেয়া না, এটাও মনে রাখা দরকার। মিনমিনে তোষামোদি অনুযোগ-অভিযোগ দিয়ে আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায় না। এর জন্যে শক্তভাবে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে মুখোমুখি মোকাবেলা করতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে লিবারেল প্রোপাগ্যান্ডা ও রেটোরিকের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকা ও ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের (Alt Right, Identitarian, White Supremacists, Neo-Nazis) সাফল্য থেকেও এ চিরাচরিত সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপসংহার

দিনশেষে বাস্তবতা হল, সবসময় এমন কিছু মানুষ থাকবে যাদের মধ্যে সংশয় থেকে যাবে। এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা মুরতাদ হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ মুনাফিক হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে। ভেতর থেকে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, ষড়যন্ত্র করবে। যাদের অন্তরে রোগ আছে এটা হবেই। হিদায়াত একমাত্র আল্লাহরই পক্ষ থেকে। কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি তা হল মুসলিমদের মধ্যে সংশয় তৈরি হবার মাত্রা কমিয়ে আনা। যারা দুর্বল ঈমান, অজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব ইত্যাদির কারণে ফিতনাতে পড়ে যাচ্ছেন, আমরা তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি।

আর এটা করা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা আনঅ্যাপোলোজেটিকালি ইসলামকে আঁকড়ে ধরবো, আমাদের মুসলিম পরিচয়কে আকড়ে ধরবো। ইসলামের হুকুম আহকামের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ তখনই সৃষ্টি হয় যখন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অন্তরে সংশয়-সন্দেহ থাকে। হুকুম-আহকাম কিংবা নৈতিকতা নিয়ে সংশয় তাওহিদ নিয়ে সংশয়ের সিম্পটম। ইসলাম নিয়ে, ইমান নিয়ে যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে, যদি ইসলামের চেয়ে অন্য কোনো নৈতিকতা, দর্শন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের প্রিয় হয়, তাহলে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশয়ে পড়াটাই

Scanned by CamScanner

স্বাভাবিক। ইসলাম হল একমাত্র সিস্টেম যেটা ১০০% ঠিক। বাকি সব বিভিন্ন মাত্রা ও অনুপাতে বাতিল। বাতিল এই সিস্টেমগুলোর মধ্যে কোনটাতে ১০% কোনটাকে ২০, কোনটাতে ৩০% ভালোর মিশ্রন থাকতে পারে, কিন্তু বাকিটুকু বাতিলই। আর এগুলোর সাথে যখন আমরা ইসলামকে মেলাতে যাবো তখন ভেজাল লাগবেই। আর হক্ব কখনোই বাতিলের কাঠামোতে বসতে পারে না।

একট চরম মাত্রার বস্তুবাদী ভোগবাদী কালচারের নৈতিকতার ধারণার সাথে ইসলাম মিলবে না এটাই স্বাভাবিক। বদ্ধ পাগল না হলে কে ইসলামকে এটার সাথে মেলাতে যাবে?

মুসলিমদের হীনমন্যতা ও সংশয়ের বড় একটি কারণ হল মিডিয়া এবং পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সক্রিয় সমর্থনের মাধ্যমে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রভাব বিস্তার করা লিবারেল-সেক্যুলার দর্শন। এ চিন্তাধারা নৈতিকতার এমন এক কাঠামো দাঁড় করায় যা ইসলামের সাথে সাঙ্ঘর্ষিক। মডারেট সিভিল ডেমোক্রেটিক “ইসলাম” ও এর প্রচারকদের সমস্যা হল তারা পশ্চিমা অবস্থানের প্রথম ধাপটাকে (Premise) মেনে নিয়ে, ইসলামকে পশ্চিমের মানদন্ডে উত্তীর্ন করাতে চান। যার ফলাফল হল আম ও ছালা দুটোই হারানো। এর ফলে তারা সংশয়ের পথ ও সম্ভাবনাকে আরো বেশি উন্মুক্ত করে দেন।

এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান হলো সালাফ আস-সালেহিনের বুঝ অনুযায়ী ইসলাম প্রচার করা, পশ্চিমের সাথে কম্প্যাটিবল “ইসলাম” না। পশ্চিমের ছাঁচে ফেলে ইসলামকে দেখলে হবে না, বরং ইসলামের অবস্থান থেকে পশ্চিমের মোকাবেলা করতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা আমাদের শেকড়ে ফিরে যাবো, হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলবো, পশ্চিমা আদর্শের আবর্জনা ত্যাগ করবো এবং ঐ পথের ওপর ফিরে যাবো যে পথে প্রথমবার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, মক্কা বিজিত হয়েছিলো।

ইসলাম নিয়ন্ত্রিত হয় না, নিয়ন্ত্রন করে।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

২য় অধ্যায়

স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং কিছু বিভ্রান্তির অবসান

নাফিস শাহরিয়ার

যা থাকছে-

- স্রষ্টার অস্তিত্ব ও মানবীয় ফিতরাত
- স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি
- স্রষ্টার একত্বের বিপরীতে অপযুক্তির অপনোদন

Scanned by CamScanner

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই নিজেকে অন্য কারো কাছে সমর্পণ করার সহজাত প্রবণতা আছে। এই 'অন্য কেউ' হয় তার থেকে শক্তিশালী বা তার থেকে শ্রেষ্ঠতর কোনো একজন। আস্তিক এবং নাস্তিক- উভয়ের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য আছে, তা সে স্বীকার করুক বা না করুক। শুধু পার্থক্য হলো আস্তিকেরা এই কাজটা করে নিজের ধর্ম অনুযায়ী, আর নাস্তিকেরা কোনো ধর্মীয় নীতি ছাড়াই। তারা মানুষের মধ্যে বিশেষ কোনো শ্রেণীকে বা মানুষের তৈরি কোনো বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যেমন- নাস্তিকদের কাছে কোনো সমস্যার সমাধান চাওয়া হলে তারা কোনো উৎস থেকে পাওয়া চিন্তা বা যুক্তি দিয়ে উক্ত সমস্যা সমাধানের কথা বলে। এখানে তারা উক্ত চিন্তার উৎসকে চরম নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং তার কাছে মাথা নত করে। একে বলে আপিল টু অথোরিটি (Appeal to Authority)।

বর্তমান কালের নাস্তিকদের কাছে এই 'স্রষ্টা'র আসনে আছেন রিচার্ড ডকিন্স নামে এক বায়োলজিস্ট, একই সাথে তারা নিজেদেরকে 'বিজ্ঞান'- এর দাস হিসেবেও স্বীকার করে নিয়েছে (যদিও বা তারা জানে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব পরিবর্তনশীল এবং ধ্রুব সত্য নয়)। সমাজতন্ত্রীরা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও কার্ল মার্কস, লেনিন- এদেরকে তাদের প্রভু হিসেবে পরোক্ষভাবে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে তাদের সামনে নত করে রেখেছে।

কোন নাস্তিকের কাছে সমস্যার সমাধান চাওয়া হলে সে কখনোও বলে না যে, 'আমি কিছুই মানি না বা কিছুই বিশ্বাস করি না, তাই আমি কিছুই বলবো না।' বরং সে তার লালিত বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয়া কনসেপ্ট অনুযায়ী কথা বলা শুরু করে। এ ব্যাপারে অমুক বিজ্ঞানী এরকম বলেছেন, তমুক ঐরকম বলেছেন- এভাবে সে আসলে কোনো একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সে এক্ষেত্রে তাদেরকেই প্রাধান্য দেয় যাদের সাথে তার চিন্তাধারা বা আদর্শের মিল আছে। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, সে তার এই বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, যার কারণে সে বার বার উক্ত

Scanned by CamScanner

উৎসের কাছে ফিরে যায়। আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখবো যে, ব্যাপারটা সহজাত এবং সবার ক্ষেত্রেই ঘটে। মানুষ তার শক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগেও যখন সফল হতে পারে না বা উদ্ধার পেতে পারে না, তখন সে নিজের অজান্তেই এক মহাশক্তির দারস্থ হয়। এটি মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি যা প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রেই এক। এখানে এসে নাস্তিকেরা প্রশ্ন করতে পারে, 'আসলে এই প্রবৃত্তির থেকেই স্রষ্টা, ধর্ম- এসবের জন্ম...' চলুন, তাহলে আরও একটু গভীরে প্রবেশ করা যাক।

লক্ষ্য করুন এখানে তারা বলছে যে এই প্রবৃত্তি থেকেই ঈশ্বরের ধারণার জন্ম, অথচ তারা কিন্তু এই প্রবৃত্তির উৎপত্তিটা কিভাবে হল- সেটি অনুসন্ধান করছে না। প্রত্যেকটি মানুষই এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের স্বাভাবিক অনুভূতি নিয়ে জন্মায়, এই অনুভূতিকে ইসলামের ভাষায় 'ফিতরাহ' বলে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির 'Centre for Anthropology and Mind' বিভাগের সিনিয়র রিসার্চার ড. জাস্টিন বেরেট দীর্ঘ ১০ বছর শিশুদের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে বলেছেন:

> *"Young people have a predisposition to believe in a supreme being because they assume that everything in the world was created with a purpose."*
>
> *"If we threw a handful (of babies) on an island and they raised themselves I think they would believe in God."*
>
> *"সাধারণত বাচ্চারা মনে মনে আগে থেকেই বিশ্বাস করে যে, একজন অতিপ্রাকৃত সত্তা কোনো একটি উদ্দেশ্যে এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছে... যদি কোনো দ্বীপে কিছু শিশুকে ছেড়ে দিয়ে নিজে নিজেই বেড়ে উঠার সুযোগ দেওয়া হয়, দেখা যাবে, তারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে।"* [১]

আপনি যদি কোনো বিজ্ঞানী বা যুক্তিবাদীকে টেবিলের উপর একটা ল্যাপটপকে দেখিয়ে বলেন যে, এটা এখানে কেউ আনে নি, এটা আগে থেকেই এখানে ছিল, এটার কোন মেকার বা স্রষ্টা নেই। তাহলে সে আপনাকে চরম মূর্খ বলবে। কারণ এটা যে এমনি এমনি এখানে আসতে পারে না, সেটা বাচ্চা ছেলেও জানে। একটি মোবাইলের কথাই ধরুন, একটা মোবাইল ফোনের প্রধান উপাদান হলো বালি। যেটা হলো ভিতরের সেমিকন্ডাক্টর চিপের উপাদান (সিলিকন) আর উপরের কেসিংটা প্লাস্টিকের তৈরি। এখন একটা প্লাস্টিককে বালিতে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর রেখে দিলে একটা প্রোগ্রামেবল মোবাইল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা (probability) কতটুকু? আবার,

একটা বানরকে যদি কিবোর্ড দিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে দেয়া হয়, তাহলে

Scanned by CamScanner

একটা অর্থপূর্ণ বাক্য, যেমন- I am a monkey, এটা পাওয়ার সম্ভাবনা কত? এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয়, দুটো ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতা নির্ভর করছে বুদ্ধিমত্তার উপর। এই মহাবিশ্ব randomly তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক কম, যেটা Higher Intellectual ছাড়া probability বাড়ানো সম্ভব না।

কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, আপনি এই একই ধরণের প্রশ্ন যখন বিশাল কোনো কিছুর ক্ষেত্রে করবেন, অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে, তখন যদি আপনি বলেন, এটা আগে থেকেই ছিল- তাহলে সেই একই বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদী আপনাকে বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত করবে? যদি কোনো নাস্তিককে প্রশ্ন করা হয়, মানুষ কিভাবে এসেছে, তাহলে সে আপনাকে বিবর্তনবাদের কথা বলবে। এখন যদি তাঁকে প্রশ্ন করেন সেই এককোষী অণুজীব বা first living cell কিভাবে আসলো? তাহলে সে আপনাকে ২ ধরনের উত্তর দিতে পারে-

১। এটা আগে থেকেই ছিল (!)।

২। Random Chemical process

আপনি এখানেও একই প্রশ্ন করতে পারেন এগুলো কিভাবে শুরু হলো? সে বলবে সবই 'প্রকৃতি'র তৈরি। কিন্তু এই প্রকৃতি যে কী জিনিস সেটার নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা আমি আজ পর্যন্ত কারো কাছে পেলাম না। এখানেও সেই একই প্রশ্ন চলে আসে, প্রকৃতিকে অস্তিত্বে আনলো কে? আপনি যদি বলেন এক মহাবিস্ফোরণের ফলে এই নিখুঁত সিস্টেমটা তৈরি হয়েছে, সেটা খুব লজিক্যাল কথা হবে না। ব্যাপারটা অনেকটা দুইটা ফেরারি এবং পোরশে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে একটা বিএমডব্লিউ গাড়ি তৈরি হওয়ার মতো! Explosion create chaos, not discipline. এখানেও একটা কথা আসে যে এই বিস্ফোরণটাই বা কিভাবে হলো বা কেন হলো? আর যদি বলেন এই বিস্ফোরণের আগে কি ছিল, তাহলে সে আপনাকে singularity-র কথা বলবে। সেটা কিভাবে হলো? এভাবে আপনি যে পথেই আগান না কেন আপনাকে এক সময় থামতেই হবে। আপনাকে কোনো একটা কিছু বা কোনো পয়েন্টকে constant বা reference ধরতেই হবে। এরপর সেটার ক্ষেত্রে বলতে হবে, 'এটাকে কেউ সৃষ্টি করে নি। এটা আগে থেকেই ছিলো। ছিলো তাই ছিলো!'

সুতরাং, আমরা বিজ্ঞান দিয়ে লজিক দেয়ার ক্ষেত্রেই বলি আর সাধারণ কমন সেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রেই বলি এমন কিছুর অস্তিত্ব সবসময় থেকেই যাচ্ছে যাকে আমরা বিলীন করতে পারছি না। আমরা আস্তিকেরা এই অদৃশ্য সত্ত্বাকে স্রষ্টা বলি। এখন যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করে নেই, তাহলে প্রথমেই যেই প্রশ্নের উদয় হয়

Scanned by CamScanner

সেটা হলো, এই স্রষ্টা কি মহাবিশ্ব বা প্রকৃতি হতে পারে না? কেন সেটাকে আলাদা কোন সত্ত্বা ধরতে হবে? এর উত্তর হলো, না পারে না। যদি Big bang theory-র উপর ভিত্তি করে আমরা যুক্তি দাঁড় করাই, তাহলে এই তত্ত্ব অনুযায়ী এই মহাবিশ্বের একটা শুরু আছে। পৃথিবীর অন্যতম বড় পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং নিজেও তার ওয়েবসাইটে এই সম্পর্কে লিখেছেন:

> *The conclusion of this lecture is that the universe has not existed forever. Rather, the universe, and time itself, had a beginning in the Big Bang, about 15 billion years ago. –*
>
> *The Beginning of Time, Stephen Hawking*

"এই বক্তৃতা শেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব চিরকাল বিদ্যমান ছিল না। বরং, মহাবিশ্ব, এমনকি স্বয়ং সময়ের সূচনা হয়েছিল বিগ ব্যাঙ্গের মধ্য দিয়ে, প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে।"[২]

যার শুরু থাকে তার সৃষ্টি হওয়ারও একটা কাল থাকে, আর যে সৃষ্টি হয় – তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা থাকে। কাজেই মহাবিশ্ব নিজে কখনোই স্রষ্টা হতে পারে না। আরো একটা ব্যাপার হলো, মহাবিশ্ব বা প্রকৃতির কি বুদ্ধি বা চিন্তা করার ক্ষমতা আছে? যদি না থাকে, তাহলে বুদ্ধিহীন প্রকৃতি কিভাবে বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টি করে? আর যদি চিন্তা করার ক্ষমতা থেকেই থাকে, তাহলে তো নাস্তিকরা আর স্রষ্টা নাই বলে চিল্লানোর কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। কিন্তু আমরা যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে দেখলাম যে, প্রকৃতি বা মহাবিশ্ব নিজেই সৃষ্ট। তাই এগুলোকে স্রষ্টা হিসেবে ধরে নেয়া যাচ্ছে না। একইভাবে, আমরা যদি অন্যান্য বৃহৎ কোনো কিছুর দিকে লক্ষ করি তাহলেও দেখবো যে আকৃতির বিশালতা এবং কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য ছাড়া কারও মধ্যেই আসলে খুব বেশি পার্থক্য নেই। যেমন- সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত এদের কারোর কোনো বিচারবুদ্ধি নেই; সবই জড় পদার্থ। অতএব, এদের কেউই স্রষ্টা না।

> *"তারা কি সৃষ্ট, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং (বাস্তবতা তো এই যে,) তারা বিশ্বাসই রাখে না। তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ কি তাদের কাছে, নাকি তারাই (সবকিছুর) নিয়ন্ত্রক?"[৩]*

আমাদের কাছে এখন আছে কেবল একটাই অপশন। স্রষ্টা সম্পূর্ণ আলাদা সত্ত্বা। এখন দ্বিতীয় ধাপে আমাদের মাথায় যে প্রশ্ন আসে সেটি হলো, স্রষ্টা যদি সবকিছু সৃষ্টি করেই থাকে তাহলে তাঁকে সৃষ্টি করলো কে? এখানে আমরা স্রষ্টার সৃষ্টি হওয়া নিয়ে ৩ টা তত্ত্ব পাই।

Scanned by CamScanner

১। স্রষ্টা নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করেছেন।

২। স্রষ্টাকে কেউ সৃষ্টি করেছেন।

৩। স্রষ্টাকে কেউ সৃষ্টি করে নি। তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

প্রথমটি হবে না। কারণ নিজেকে সৃষ্টি করতে হলে প্রথমে নিজের অস্তিত্ব থাকতে হয়। আর যার নিজের অস্তিত্ব আছেই, তার নিজেকে সৃষ্টি করার প্রশ্নটাও অবান্তর। এটা কিভাবে সম্ভব যে যিনি আগে থেকেই ছিলেন (নিজেকে সৃষ্টি করার জন্য), আবার একইসাথে সৃষ্টিও হচ্ছিলেন?!

দ্বিতীয়টিও অযৌক্তিক। কারণ স্রষ্টাকে যদি অন্য কেউ তৈরি করে থাকে, তাহলে তো স্রষ্টা আর স্রষ্টা থাকেন না। তিনিও আমাদের মত সৃষ্ট হয়ে যান। বরং তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই প্রকৃত স্রষ্টা। তাহলে তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে? সেই মহাসত্তাকে যে সৃষ্টি করেছে, সেই মহা-মহাসত্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? সেই মহা-মহাসত্তাকে যেই মহা-মহা-মহাসত্তা সৃষ্টি করেছে, তাকে কে সৃষ্টি করেছে?... এই প্রশ্নের শেষ নেই। এটা চলতেই থাকবে। আর এটা সম্ভব না, কারণ একটু আগেই আমরা দেখেছি যে প্রকৃতি বা মহাবিশ্ব সৃষ্ট। আর যে সৃষ্ট তার পক্ষে আগে থেকেই থাকা সম্ভব না।

ধরা যাক, আপনি একজন সৈনিক। গুলি করার আগে আপনাকে আপনার পেছনের একজন সৈনিকের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু তাকেও তার পেছনের সৈনিকের অনুমতি নিতে হবে, আপনাকে অনুমতি দেওয়ার আগে। এভাবে পেছনের দিকে অসীম সময় পর্যন্ত অনুমতি নেওয়া চলতে থাকবে। বলুন তো এভাবে চলতে থাকলে আপনি কি আদৌ কোনোদিন গুলি করতে পারবেন? আপনাকে অবশ্যই কারও নির্দেশকে ধ্রুবক ধরে সেই কমান্ডকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এমনটা হলে কোনোদিন কোনো ঘটনা ঘটতো না। তারমানে কখনোই অসীম পর্যন্ত কোনো ঘটনার পেছন দিকে যাওয়া সম্ভব না।

আরেকটা উদাহরণ দেখি। আপনার সামনে যদি ৫০ জন থাকে, তাহলে আপনি ৫০ জনের পরে বাসে উঠার সুযোগ পাবেন। যদি আপনার সামনে ৫০০ জন থাকে তাহলে আপনি ৫০০ জনের পরে বাসে উঠতে পারবেন। কিন্তু যদি আপনার সামনে অসীম সংখ্যক লোকের লাইন থাকে, তাহলে কি আপনার বাসে উঠার পালা কখনো আসবে? না, কখনো আসবে না। কেননা, অসীম সংখ্যক লোকেরও বাসে উঠা কখনও শেষ হবে না, আর আপনারও বাসে উঠার পালা কখনোই আসবে না।

এবার উল্টোভাবে চিন্তা করুন। ধরুন, একটা লোক তার সামনের লোকদের বাসে

Scanned by CamScanner

উঠার পরে সে বাসে উঠেছে। এখন এই লোকটা কত জনের পর উঠেছে? যত জনের পরেই উঠুক না কেন, সেটার অবশ্যই একটা সীমা আছে। একথা বলা যাবে না যে, সে অসীম সংখ্যক লোকের পর বাসে উঠেছে। কেননা তার সামনে যদি অসীম সংখ্যক লোকই থাকতো, তাহলে তো সেই অসীম সংখ্যক লোকেরও কোনদিন বাসে উঠা শেষ হতো না, আর তারও কোনদিন বাসে উঠার পালা আসতো না। কিন্তু যেহেতু তার পালা এসেই গেছে, বাসে যেহেতু সে উঠেই গেছে- এটাই অকাট্য প্রমাণ যে সে সসীম ও নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু লোকের পর বাসে উঠেছে। ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্ব যেহেতু অস্তিত্বে এসেই গেছে, এটাই অকাট্য প্রমাণ যে এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পিছনে কারণের কোনো অসীম লাইন নেই। বরং শুরুতে এমন একজন স্রষ্টা আছেন যার পিছনে আর কোন স্রষ্টা নেই।

স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো, এই প্রশ্নের মাঝে একটা ফাঁক আছে। সেটা হলো প্রশ্নকারী বিনা প্রমাণে আগেই ধরে নিয়েছেন যে, স্রষ্টাকে সৃষ্টি করা হয়েছে; তিনি একসময় ছিলেন না। যেমন- আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, স্রষ্টার সন্তান কয়জন? এর মানে হলো, আপনি আগেই বিনা প্রমাণে ধরে নিয়েছেন যে, স্রষ্টার সন্তান আছে। অথচ এরকম বিনা প্রমাণে কিছু ধরে নিয়ে, তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করা একেবারেই অযৌক্তিক। এ ধরনের প্রশ্নকে বলা হয় লোডেড কোয়েশ্চেন (Loaded Question)।[৪] 'এখনও বউকে পেটান?'- এরকম একটা লোডেড কোয়েশ্চেন, যেখানে ধরে নেয়া হচ্ছে- প্রথমত, আপনার বউ আছে। দ্বিতীয়ত, আপনি তাকে পেটাতেন।

তাই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবার পর, তাকে কে সৃষ্টি করলো- এই প্রশ্ন করার আগে আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি একসময় ছিলেন না, তাকে পরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা প্রমাণ না করে তাকে কে সৃষ্টি করলো, এই প্রশ্ন করাটা একেবারেই অযৌক্তিক। যেমন আমরা আগে প্রমাণ করেছি যে, এই মহাবিশ্ব একসময় ছিল না, পরে অস্তিত্বে এসেছে।

> *আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল(স.) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়।[৫]*

আমাদের তাহলে তিন নম্বর থিওরিতেই যেতে হচ্ছে। অর্থাৎ, স্রষ্টা সম্পূর্ণ আলাদা সত্ত্বা, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অনন্তকাল ধরে আছেন এবং থাকবেন।

Scanned by CamScanner

স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা সত্ত্বা এবং অনাদি-অনন্ত হিসেবে ধরে নেয়ার পর তৃতীয় ধাপে আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হই, সেটি হল স্রষ্টা কি এক নাকি একাধিক?

আমরা যদি এই মহাবিশ্ব বা আমাদের চারপাশে তাকাই, তাহলে দেখবো যে সবকিছুই একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ এরূপ কোন অসঙ্গতিও আমরা দেখি না। যদি একাধিক স্রষ্টা থাকত, তাহলে অবশ্যই এরকমটা দেখা যেত না। কারণ তাদের উভয়ই যেহেতু বিশাল ক্ষমতাবান,তাহলে তারা অবশ্যই নিজেদের উপর এবং তাদের সৃষ্টির উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতো। কোনো বিজ্ঞানী কোনো সূত্র আবিষ্কার করার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতো যে, তার পরিশ্রম বিফলে গেছে। কারণ এক স্রষ্টা যেভাবে সিস্টেম ডিজাইন করেছিলো, অন্য স্রষ্টা তার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য আগের স্রষ্টার ডিজাইন বাতিল করে নতুন ডিজাইন তৈরি করেছে।

এটা অবশ্যই ঘটত, কারণ উভয় স্রষ্টাই বিশাল ক্ষমতাবান।[1] ক্ষমতাবান দুই স্রষ্টার মধ্যে এক স্রষ্টাই যদি সবসময় ক্ষমতা প্রদর্শন করতে থাকে, তাহলে অন্য স্রষ্টার ক্ষমতা আছে এর প্রমাণ কোথায়? আর এক স্রষ্টা অন্য স্রষ্টার কর্তৃত্ব মেনে নিবেনই বা কেন? আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে কোনো ইলাহ্ নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো।"[৬] যদি একাধিক স্রষ্টা থাকতো, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বহু মৃত ব্যক্তি হরহামেশাই জীবিত হত!

---

[1] এটা সাধারণ মানুষের স্বভাব ও,বটে। মানুষের আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ফিতরাত তো এমনই যে সে একই সাথে দুই সার্বভৌম সত্ত্বার নির্বিঘ্ন অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে না। যেমনঃ এই ক্ষেত্রে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে তাই উল্লেখ করছি। হিন্দুদের পূজিত একজন দেবতা হলো হনুমান। তাকে বলা হয় সে বানর জাতির অন্তর্ভুক্ত (যদিও এই নিয়ে অনেক মতভেদ আছে দেখুন: Hanuman in the Ramayana of Valmiki and the Ramacharita Manasa of Tulasi Dasa), শৈশবকালে একদিন সে সূর্যকে ভুল করে খেয়ে ফেলতে অগ্রসর হলে ইন্দ্র তাকে আঘাত করে মেরে ফেলে, তখন এই শোকে হনুমানের পিতা পবন (বায়ু দেবতা) সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে সৃষ্টি অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যায়। ... যদি ও এই ঘটনার উৎস শতভাগ মানোত্তীর্ণ নয়, তবুও এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, একাধিক সার্বভৌম/শক্তিমান সত্ত্বার যুগপৎ অস্তিত্ব সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে, কেননা মানুষের সাধারণ বিবেক ও যুক্তি কখনোই একের অধিক সার্বভৌম ও অনন্ত সত্ত্বার নির্বিঘ্ন অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে না।- সম্পাদক

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, একাধিক স্রষ্টা থাকাও সম্ভব না। তারমানে স্রষ্টা হল একক, তার সৃষ্ট সবকিছু থেকে আলাদা, অনাদি-অনন্ত, সর্বশক্তিমান সত্ত্বা। আল্লাহ্ কুরআনে নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন-

"১। বলো, তিনিই আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়।

২। আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন।

৩। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি।

৪। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"[৭]

Scanned by CamScanner

তথ্যসূত্র:

[১] Born Believers: The Science of Children's Religious Belief – Dr. Justin L. Barrett

[২] http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html

[৩] সূরা তূর ৫২: ৩৫-৩৭

[৪] https://en.wikipedia.org/wiki/Loaded_question

[৫] সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৩২৭৬

[৬] সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: ৯১

[৭] সূরা ইখলাস ১১২: ১-৪ স্রষ্টার অস্তিত্ব, অতঃপর... – এম. ডব্লিউ. জেড. মুন্না
http://www.hamzatzortzis.com/2425/divine-singularity-how-do-we-know-god-is-one/

Scanned by CamScanner

৩য় অধ্যায়

বিবর্তন বনাম স্রষ্টা ?

ডা. রাফান আহমেদ

যা থাকছে-

- বিজ্ঞানের সীমা পরিসীমা
- স্রষ্টার অস্তিত্ব ও বিজ্ঞান
- বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টার অস্তিত্ব

Scanned by CamScanner

"এই মহাবিশ্বের বিস্ময় দেখে আমার এক সময় একজন মহানির্মাতার ছবি মনে আসত। ডারউইনের বিজ্ঞান পড়ার পর, সেই ছবি মন থেকে উধাও হয়ে যায়।" [১]

– রিচার্ড ডকিন্স

আমরা অধিকাংশই সেলিব্রেটি কালচারে আক্রান্ত। পূজিত ব্যক্তিজন কিছু বললেই আমরা তা মাথা পেতে নেই, বুঝি বা না-বুঝি; ভান করি সব বুঝে গেছি। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত ও জনপ্রিয় নাস্তিকদের তালিকায় প্রফেসর ডকিন্স প্রথমই হবেন হয়তো। মিলিয়ন মিলিয়ন কপি বিক্রি হওয়া বইয়ের লেখক, অক্সফোর্ডের সাবেক অধ্যাপক কি আর ভুল বলবেন? কিন্তু বাস্তবতা হলো, তিনি ভুল বলেছেন। যার দোহাই দিয়ে ভুল বলেছেন সেই ডারউইন সাহেবও তার এই বক্তব্যের সাথে একমত নন! অবাক হচ্ছেন? হওয়ারই কথা।

আসুন ডকিন্সের বক্তব্য একটু ব্যবচ্ছেদ করি। ১ম অংশটা খেয়াল করুন – ফিতরাহ-এর অনুভূতির স্বীকারোক্তি স্পষ্ট! মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় দেখে এক মহানির্মাতার অস্তিত্বের অনুভূতির ব্যাপারটা মানুষের মনস্তত্ত্বে গ্রথিত বলা যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে পাওয়া পর্যবেক্ষণও তাই জানাচ্ছে। [২] তাছাড়া ডকিন্সের আরেকটি উক্তিতে এই ফিতরাহ-এর অনুভূতির স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়! এক বিতর্কে তিনি বলেন :

"আমার মনে হয়, আপনি যখন এই জগতের সৌন্দর্য অবলোকন করেন, এবং ভেবে আকুল হন যে, কীভাবে এই অবাক মহাবিশ্ব অস্তিত্বে এলো আপনি স্বভাবতই এক সশ্রদ্ধ বিনয়, এক মুগ্ধতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হন। এবং আপনি কোনো সত্তাকে প্রায় উপাসনা করার ইচ্ছা অনুভব করেন। আমিও এমনটি অনুভব করেছি, অনুভব করেছেন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা, যেমন-কার্ল স্যাগান এমন অনুভব করেছেন, আইনস্টাইনও এমন অনুভব করেছিলেন । আমরা সকলেই একরকম ধর্মীয় ভক্তি অনুভব করেছি, এই মহাবিশ্বের সৌন্দর্য দেখে, প্রাণের জটিলতা দেখে; মহাকাশের বিশালতা, ভূতাত্ত্বিক সময়ের পুরো ব্যাপ্তি অনুমান করে । সেই সশ্রদ্ধ বিনয় ও উপাসনার অনুভূতিকে কোনও বিশেষ কিছু—কোনো সত্তা, কোনো শক্তিকে উপাসনা

Scanned by CamScanner

করার ইচ্ছায় রূপ দিতে প্রলুব্ধ হয়েছি। আপনারা হয়তো সে অনুভূতিকে এক স্রষ্টা, এক বিনির্মাতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করতে চান।" [৩]

কিন্তু এ সত্য অনুভূতি গোপন করতে তিনি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। শুরুতে উক্ত উদ্ধৃতি সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এবার ২য় অংশে আসি। তিনি বলেছেন – ডারউইনের বিজ্ঞান পড়ার পর সেই মহানির্মাতার ছবি মন থেকে উধাও হয়ে যায়। এই উক্তিটিতেই যত গণ্ডগোল! কেন?

বিজ্ঞান কাজ শুরু করার আগে কতগুলো অনুমান বা এসাম্পসনকে ঠিক বলে ধরে নেয়। [৪] এগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অনুমান হলো Methodological Naturalism বা পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ। এর অর্থ হলো – আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে সেসব প্রাকৃতিক ঘটনাবলির জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়াই যথেষ্ট। বস্তুজগতের বাইরের কিছু বা প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরের কিছুকে (যেমন – স্রষ্টা, মালাইকা, মন ইত্যাদি) কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ টেনে আনা যাবে না। তাই স্রষ্টা আছে না-কি নেই, এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞান নীরব; কারণ, এটা তার নাগালের বাইরে। আমেরিকার বিখ্যাত ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সাইন্সেস-স্বাক্ষী দিচ্ছে :

"বিজ্ঞান হলো প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একটি উপায়। প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জাগতিক ব্যাখ্যা প্রদানেই এটি সীমাবদ্ধ। অতিপ্রাকৃত কিছু আছে কি না, সে বিষয়ে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না। স্রষ্টা আছে কি নেই, এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিজ্ঞান নীরব।" [৫]

কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে অত্যুৎসাহি তরুণদের মন এই সত্য জানে না বা মানতে পারে না। খ্যাতনামা পদার্থবিদ প্রফেসর এম. এ. হারুন অর রশিদ এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন :

"ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয়, এটা বুঝতে তরুণ মনের সময় লাগে অনেক" [৬]

যেহেতু পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসের কারণে, বিজ্ঞান স্রষ্টাকে সমীকরণের বাইরে রেখে যাত্রা শুরু করে, তাই বৈজ্ঞানিক বিবর্তনতত্ত্বের প্রচেষ্টাও হলো মানুষসহ সকল প্রাণের বিকাশের জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়া। এই বিবর্তনতত্ত্বের আলোচনা শুরু হয় প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে। বাংলার মুক্তমনা পরিবারের একজন এ-বিষয়টি স্বীকার করে বিবর্তনের স্বপক্ষে লেখা গ্রন্থে বলেন:

"অনেকে মনে করেন, বিবর্তন তত্ত্ব বোধ হয় প্রাণের উৎস নিয়েও কাজ করে। উৎস নিয়ে আসলে বিবর্তন তত্ত্বের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। এটি কাজ করে মূলতঃ প্রাণের

Scanned by CamScanner

উৎপত্তির পর থেকে কীভাবে তার বিকাশ ঘটেছে তা নিয়ে।" [৭]

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ লরেন্স.এম.ক্রাউস(নাস্তিক) বলেন,

> *"বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে বিবর্তনবাদ স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের বিষয়ে কিছুই বলে না। এমনকি প্রাণ কীভাবে উৎপত্তি হল সে বিষয়েও কিছু বলে না বরং কীভাবে পৃথিবীর এত বৈচিত্রময় প্রজাতির আবির্ভাব হল তা নিয়ে আলোচনা করে"* [৮]

মজার ব্যাপার হলো - প্রাণের উৎপত্তির কীভাবে হলো এর সমাধান বিজ্ঞানের কাছে নেই। নাস্তিকেরা বলতে চান, প্রাণ স্বত;স্ফূর্তভাবে হঠাৎ করে তৈরি হয়ে গেছে! ছু মন্তর ছু! বাহ! অথচ নাস্তিক বিজ্ঞানী হুবার্ট ইয়োকি গবেষণার দ্বারা প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানী মহলে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাবনের প্রচলিত বিশ্বাস কেবলই অন্ধবিশ্বাস।[৯]

ডিএনএ-এর মতো এত সুসজ্জিত ও অকল্পনীয় তথ্যে ঠাসা মহাজটিল অণু কীভাবে উৎপত্তি হলো তার নিশ্চিত উত্তর বিজ্ঞানের কাছে নেই। বিজ্ঞানী ট্রেভর ও অ্যাবেল পিয়ার রিভিউড পেপারে দেখিয়েছেন, এই চান্স/নেসেসিটির গালগপ্পো দিয়ে ডিএনএ-র উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। হঠাৎ করে হয়ে গেছে এমন হাস্যকর বুলি আওড়ানোর দ্বারা প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না।[১০]

কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান এসবের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বা স্রষ্টাকে ডেকে আনতে পারে না। যেভাবেই হোক একটা জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। জীববিজ্ঞানী স্কট টড Nature এ প্রকাশিত এক চিঠিতে বলেছিলেন,

> *"এমনকি যদি সকল উপাত্ত কোন বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, এমন অণুকল্প বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হয় কারণ এই ব্যাখ্যা বস্তুবাদি নয়"* [১১]

কাউকে আগেই ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর যদি বলা হয়, তাকে ঘরে খুঁজে পাওয়া যায় নি; তাহলে বিষয়টা কেমন দাঁড়ায়? তাই ডারউইনের বিজ্ঞান পড়ে কেবল তার মন থেকেই স্রষ্টার ধারণা উধাও হতে পারে যে বিজ্ঞানের এসাম্পসান ও কর্মপরিধি সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা বিজ্ঞানের এই অনুমানগুলোকে ধামাচাপা দিতে চায়। বিজ্ঞানের যে-কোনো তত্ত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের ব্যাপারে নীরব।

তাছাড়া যে বিষয়টা নাস্তিকেরা প্রায় জানেনই না তা হলো -বিবর্তনের প্রচলিত তত্ত্ব মডার্ন সিন্থেসিস-এর বর্তমান বেহাল অবস্থা। বিবর্তনবাদী গবেষকদের মতেই বিংশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে পরিচালিত নানা গবেষণা থেকে এমন তথ্য বের হয়ে আসছে যার দ্বারা মডার্ন সিন্থেসিস তত্ত্বের অনুমানগুলো ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গিয়েছে! কারো কারো মতে একবিংশ শতকের শুরুতে প্রচলিত 'মডার্নিস্ট জীববিদ্যা' মুখ থুবড়ে পড়েছে![১২] সাম্প্রতিক সময়ে মডার্ন সিন্থেসিস তত্ত্বের কেন্দ্রীয় অনুমানগুলো

Scanned by CamScanner

বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে ভুল প্রমাণ করে দেখিয়েছেন খ্যাতনামা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (নাস্তিক) অধ্যাপক ডেনিস নোবেল।[১৩] পাশাপাশি বিকল্প বিভিন্ন তত্ত্ব হাজির করা হচ্ছে সেক্যুলার নাস্তিক মহলের বিজ্ঞানীদের থেকে।

বিবর্তনতত্ত্বকে ঘিরে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সমস্যা ও নানাবিধ ব্যাখ্যার মারপ্যাঁচ বাদ দিয়ে, তর্কের খাতিরে বিবর্তনতত্ত্বকে মেনে নিলেও মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও এর অভাবনীয় সুসমন্বয় (ফাইন টিউনিং), প্রাণের উৎপত্তি, ডিএনএ ও এর অকল্পনীয় সুসজ্জিত তথ্য ইত্যাদির রহস্য উদঘাটন বাকিই থেকে যায়। বেসিক রিজনিং খাটালে বোঝা যায়, এইসব বাস্তবতা এক গ্রাণ্ড ডিজাইনারের আভাস দিচ্ছে। তাই 'মানুষ বিবর্তিত সুতরাং স্রষ্টার দরকার নেই, বিজ্ঞান তাই জানাচ্ছে' নব্য-নাস্তিকদের জোরালো গলার দাবি মূলত তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক; বিজ্ঞান সম্পর্কে ও বিবর্তন সম্পর্কে।

আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, যার তত্ত্ব দিয়ে ডকিন্স নাস্তিকতাবাদ ফেরি করে বেড়াচ্ছেন সেই ডারউইন কি নাস্তিক ছিলেন? উত্তর হচ্ছে, না! জীবনের শেষকালে উনি সংশয়বাদে প্রবেশ করেন। স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অর্থে নাস্তিক তিনি ছিলেন না, নিজের মুখেই বলেছেন। তা হলে কেন সংশয় তার ভেতর বাসা বেঁধে নিলো? এর কারণ স্বীয় দর্শনগত অবস্থান, তার তত্ত্বের কারণে তিনি সংশয়বাদি হন নি।[১৪] তাছাড়া ডারউইন এক চিঠিতে নিজেও বলেছেন –

> *"কোনো ব্যক্তি একই সাথে বিবর্তনবাদি ও গোড়া আস্তিক হতে পারে।*
>
> *এ নিয়ে কোনোও প্রকার সন্দেহও আমার কাছে অবান্তর লাগে।"*[১৫]

তত্ত্বপ্রদানকারী স্বয়ং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কারনে নাস্তিক হলেন না, অথচ ডকিন্স সাহেব নাস্তিক হয়ে গেলেন। কি অদ্ভূত! আর আমরাও তার সাথে তাল মিলিয়ে নাচছি! তারা আমাদের নিয়ে খেলেন, আমরাও সানন্দে পুতুল হতে রাজি![১৬]

Scanned by CamScanner

তথ্যসূত্র :

(১) অতনু চক্রবর্তী, রিচার্ড ডকিন্স: ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যিনি লড়ে চলেছেন নিরন্তর! এগিয়ে চলো, ২৭ মার্চ ২০১৮

(২) এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাপত্রের রেফারেন্সসহ বিস্তারিত জানতে দেখুন : রাফান আহমেদ, অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়; পৃ. ৫৫-৬৯ (ঢাকা : সমর্পন প্রকাশন, ২য় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৯)

(৩) Richard Dawkins vs John Lennox, The God Delusion Debate. University of Alabama-Birmingham›s Alys Stephens Center, 3 October 2007

(৪) Dr. Martin Nickels, The Nature Of Modern Science & Scientific Knowledge. Anthropology Program, Illinois State University, August 1998; Macaulay A. Kenu, The Limitations of Science: A Philosophical Critique of Scientific Method. Journal of Humanities & Social Science, vol. 20, Issue 7, p.80 to 81, July 2015

(৫) https://www.nap.edu/read/5787/chapter/6#58

(৬) রায়হান আবীর ও অভিজিৎ রায়, অবিশ্বাসের দর্শন; পৃ. ২৯ (ঢাকা : শুদ্ধস্বর প্রকাশন, ৪র্থ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

(৭) বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে; পৃ. ১১ (ঢাকা, অবসর প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

(৮) Science in the Dock, Discussion with Noam Chomsky, Lawrence Krauss & Sean M. Carroll, Science & Technology News, March 2006 ,1; Retrieved from: https://chomsky.info/20060301

(৯) Hubert P.Yockey, A Calculation Of The Probability Of Spontaneous Biogenesis By Information Theory; Journal of Theoretical Biology, Volume 67, Issue 7 ,3 August 1977, Pages 398-377

(১০) J.T. Trevors, D.L. Abel, Chance and necessity do not explain the origin of life. Cell Biology International, Vol. 28, p.729-739 ,2004

(১১) Scott C. Todd, A view from Kansas on that evolution debate; Nature, vol. 401, p. 30 423 September 1999

(১২) Michael R Rose and Todd H Oakley, The new biology: beyond the Modern Synthesis. Biology Direct, 2007 ,2:30

(১৩) Denis Nobel (2013), Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology; Journal of Experimental Physiology, Vol. 98, Issue 8, p. 1235.

(১৪) Nick Spencer, Darwin and God (SPCK,31 January 2009)

(১৫) Belief In God And In Evolution Possible, Darwin Letter Says. The New York Times, 27 December 1981

(১৬) মজার ব্যাপার কি জানেন? ডকিন্স এক সাক্ষাতকারে ফস করে বলে ফেলেছেন – বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করলে তাকে নাস্তিক হতে হবে এই চিন্তা ভুল। দ্বিমুখীতা, তাই না? দেখুন: Lawrence Krauss discussion with Richard Dawkins about Education, Universe, and Evolution; Available at: https://youtu.be/WObFAvOw830

Scanned by CamScanner

৪র্থ অধ্যায়

পুঁজিবাদের কালিমা :
লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান

ড. জাভেদ আকবার আনসারী

অনুবাদঃ মিনারাহ ডেস্ক

যা থাকছে-

- পুঁজিবাদ ও মানবতাবাদ
- মানবতা ও চিরনন্তা
- মানবতাবাদ ও পুঁজিবাদ

Scanned by CamScanner

মানবতাবাদপূজা ও এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মানবিক জ্ঞান (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) অযথা টানাহেঁচড়া করার চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে গ্রীস থেকে। যেমন, ঈসা(আ) এর পাঁচশ বছর পূর্বেকার গ্রীক চিন্তাবিদ প্রুতাগোর বলেছেন,

"মানুষ এই বিশ্বজগতের সকল কিছুর পরিমাপক"

অর্থাৎ, বিশ্বজগতে মানুষই স্বয়ং সকল কিছুর উদ্দেশ্য এবং মানুষ এই ধরার সকল বস্তুকেই নিজস্ব সিদ্ধান্ত (Decision) এবং ইচ্ছা (Will) মোতাবেক নিজের অনুসারী বানাতে চায়। মূলত এখানে সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা দ্বারা মানবতাবাদীরা মানুষের কামনা-বাসনাকেই বুঝিয়ে থাকে। যা মানুষের কামনা বাসনা মোতাবেক হবে তাই ভালো। আসলে পশ্চিমা মানবতাবাদি দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ বস্তু হাসিল করতে একে অপরের প্রতিদ্বন্দী, এবং মানুষ বস্তু পাওয়ার জন্য একে অপরের সাথেও বস্তুর মতই আচরণ করে থাকে। পাশাপাশি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে নিজেকে অন্যের জন্যে নিবেদিত ভাবার ভ্রান্ত ধারণায় থাকে। সে এই কারণে সবসময় বাহ্যিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার যাদুতে মোহগ্রস্থ থাকে। পশ্চিমা ব্যবসায়িক দর্শন হিউম্যানিজমের উপর নির্ভরশীল যা সেখানকার জনগনের চিন্তাধারা থেকে ছড়িয়েছে। ।

এই দর্শন পশ্চিমের জন্য আগুনে ঘি ঢালার মত কাজ করলো এবং সনাতনী খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে একটি বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করে সর্বত্র এক মহা বিপ্লবের প্লাবন ডেকে নিয়ে আসলো যা তাদেরকে ভোগ-উপযোগ পূজারী, জাতীয়তাবাদ উপাসক এবং সাথে সেক্যুলার ও লিবারেল বানিয়ে ছাড়লো। চতুর্দশ শতক থেকে স্রষ্টার স্থান হিউম্যানিজম নিয়ে নিলো এর ফলে স্রষ্টা ও তাঁর পাঠানো প্রত্যাদেশ (বাইবেল) থেকে ইউরোপ সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেললো এবং রোমান-গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিলো। মূলত এই বিদ্রোহকে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে মানবিক জীবনের মৌলিক চাহিদা, কামনা-বাসনা, বিজ্ঞান, ব্যবসায়

Scanned by CamScanner

ও শিল্প ইত্যাদিকে রোমান-গ্রীক দর্শন ও এর আলোকমন্ডিত জ্ঞানের সাথে সমন্বয় করার এক প্রচেষ্টা বলা যায়। এই ক্ষেত্রে হাইডেগার, উইলিয়াম জিমাজ, জ্যা দেও ও শোলারের নাম উল্লেখযোগ্য। শোলার ই প্রথম হিউম্যানিজম শব্দটিকে পরিভাষারূপে ব্যবহার শুরু করে। যা মানবীয় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর নির্ভরশীল। এই দর্শনের মূল্য রেনেসাঁ যুগ থেকে শুরু হয়, যার মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব অন্য কোনো সময় প্রযোজ্য নয়। রেনেসাঁ উদ্ভূত মানবতাবাদের সাথে গ্রীকো রোমান দর্শনের সম্পর্ক বেশ গভীর ছিলো। গ্রীকো রোমান দর্শন বিবেকপ্রসূত ও উদ্দেশ্যমূলক(Telos)[1] ছিলো, এরা বিবেক ও বিবেকউদ্ভুত অনুমান শক্তির উপর প্রবলভাবে ভরসা করত। কিন্তু হালের মানবতাবাদী চিন্তাধারা পরিপূর্ণরূপে ভোগবাদী মানসিকতার অধিকারী, খাহেশাতের আরাধনাকারী ও ব্যক্তিস্বার্থপরতার পক্ষপাতী।

গ্রীকো চিন্তাধারা যেখানে বিবেক ও এর ভালো-মন্দ নির্ধারনের শক্তির উপর নির্ভর করত সেখানে বর্তমান যুগের মানবতাবাদ এর বদলে প্রত্যক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে থাকে। গ্রীকো রোমান চিন্তাধারা যেখানে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল ছিলো সেখানে বর্তমান মানবতাবাদের নকশা মুষ্টিমেয় কিছু স্বয়ংসত্য ও অনুমানের উপর বুনন করা হয়েছে। এসকল মূলনীতির উপরই পশ্চিমা চিন্তাধারার পাটাতন স্থাপিত হয়েছে। তাদের মনোযোগ শুধুমাত্র ভোগবাদ, উপযোগবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতাবাদের প্রতি উন্মুখ, অপরপক্ষে গ্রীকরা বিবেকের ভাল-মন্দ নির্ধারণের শক্তিকেই প্রত্যক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিকল্প ও সমার্থক বলে মনে করত। গ্রীকো-রোমান দর্শনে কুদরত ও ফিতরাতকে এক ধরনের উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা হলেও বর্তমান পশ্চিমা ডিসকোর্সে এসব ধারণা মেকানিজম দখল করে নিয়েছে। বর্তমান মানবতাবাদ গ্রীকো-রোমান দর্শনের সাথে একটি পর্যায় পর্যন্ত সম্পর্ক রাখে তবে পুরো পশ্চিম যেভাবে মানবতাবাদকে সারা পৃথিবীতে সার্বজনীন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেভাবে গ্রীকো-রোমানরা তাদের চিন্তাধারাকে বিজয়ী বানানোর জন্য এত সংগ্রাম করে যায়নি। মানবতাবাদকে সার্বজনীন করার থেকে পুঁজিবাদের দিকে আসার একটি কাহিনী আছে। যা রাজতন্ত্র থেকে গনতন্ত্র, দরবার থেকে বাজার, শয়তানপূজা থেকে নফসপূজা, ধনদৌলতপূজা থেকে মুনাফাভোগ, মুনাফাভোগ থেকে লাগামহীন স্বাধীনতা সবখানেই বিস্তৃত।

---

[1] Telos, an ancient Greek term meaning 'end' or 'purpose'. Telos is a key concept not only in Greek ethics but also in Greek Science- (The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd Edition, pg- 906)- সম্পাদক

Scanned by CamScanner

পুঁজিবাদের সংক্ষিপ্ত ধারণা

মানুষের প্রতি ঐশ্বরিকতা সম্বোন্ধিত করার মানসিকতাকে যদি হিউম্যানিজম সম্পর্কিত সাহিত্য দ্বারা বুঝার চেষ্টা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, এটা দ্বীনী মোকাবেলায় দুনিয়াবী, বুদ্ধিবৃত্তিক আধ্যাত্মিকতার মোকাবেলায়, জ্ঞানের মোকাবেলায় জ্ঞান। যা শর্তহীন স্বাধীনতা ও আত্ম-নির্ধারণ এ দুইটি উপাদানের অপরিহার্যতায় সাব্যস্ত হয়। এই দুই উপাদানের সাহায্যেই তা মানুষের মা'বুদিয়্যাত দাবী করে থাকে। যার মাধ্যমে মানুষের অনুভুতি আকাঙ্খাকে নাফরমানীর কাজে প্ররোচিত করে থাকে। ঐতিহাসিক ভাবে মানবতাবাদ এই চেষ্টা-প্রচেষ্টারই নাম যেখানে মানুষ তার সৃজনশীলতা, শক্তি-সামর্থ্যকে যথাসাধ্য প্রকাশিত করে নিজেকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যরূপে পেশ করার চেষ্টা করে, যাতে মানবতাবাদের দাবীতে সত্যতার ছোঁয়া থাকে। যাতে বোঝা যায় এর সকল প্রচেষ্টাই কল্যাণের ফলাফল, সে যেই কাজই করুক না কেন, কল্যাণ আর কল্যাণেরই প্রতিচ্ছবি সেখানে থাকবে, এই সকল কল্যাণকর শক্তি তার নিজস্ব অস্তিত্বেরই অংশ। তার মা'বুদিয়্যাত প্রত্যক্ষ করার আবার রকমফের আছে, সে চায় তো ছায়াতে আলো আর আলোতে ছায়া বানিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে। আর এসবই তার মহত্ত্বের নিদর্শন, তাই তার সকল কাজকর্মের একমাত্র আশ্রয় কল্যাণ আর শান্তি। পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধের স্থলে প্রয়োজন, ভালোবাসার বদলে প্রতিযোগিতাকে প্রাধান্য দেয়। যাতে মানুষ তার বাতিল চাহিদাসমূহকে মা'বুদিয়্যাতের দিকে উসকিয়ে দিয়ে তার মা'বুদিয়্যাতের অধিকারের পথে এগুতে পারে, আর লা-ইলাহা-ইল্লাল ইনসান বলার মুখাপেক্ষী হয়ে যায়।

এভাবেই সে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে নিজের নফসপরস্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও অধিকার আদায়ের অধিকার আদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বয়ং প্রমাণিত সত্যের রুপ দিয়ে থাকে, ফলে সে মনে করতে থাকে যে সে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা রাখে। সে যা চায় তাই চাইতে পারে। মানবতাবাদীদের নিকট সে এমন এক সত্তা, যে স্রষ্টায় বিশ্বাসের কুসংস্কার ও নিয়মকানুনের শেকলের বাঁধা মুক্ত, যে সকল বাধা ডিঙিয়ে সকল সীমা ও উদ্দেশ্যের প্রতি নজর রাখতে পারে। প্রত্যেক মানবতাবাদীই 'সময়ের সন্তান' হয়ে থাকে। সে তার অবস্থাকে প্রতি মূহুর্তে ভালো থেকে ভালোর পথে সজ্জিত করতে চেষ্টা করে। তার সকল দৃষ্টি এই বাহ্যিক দুনিয়াটাকে ঘিরেই হয়, তাই জান্নাত বা মৃত্যুপরবর্তী দুনিয়ার কোনো জ্ঞান সে লাভ করতে পারে না। সামাজিক বিজ্ঞানের আতশী কাঁচ দিয়ে দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ করার কারণে দুনিয়ায় তার কাছে একমাত্র মাপকাঠি নিজের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা।

Scanned by CamScanner

এরই মাধ্যমে সে দুনিয়ায় ভালো কিছু করতে চায়। এসব জযবার বেলুনের হাওয়া দিয়েই সে ফিতরাত বিবর্জিত এক ধরনের সুপারম্যান মানুষ তৈরী করতে চায়, এইদিক থেকে হিউম্যানিজম আল্লাহ ও তাঁর কানুনের বিরুদ্ধে ঘোষিত সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। এগুলো সেই চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি যার কদর বর্তমান দুনিয়ায় অনেক। যা মানুষকে অন্ধকার ও প্রচন্ড ঘনকালো দুর্দশার কুন্ডলীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যা আখিরাত সম্পর্কীয় চিন্তার পরিবর্তে ধনদৌলত কামানোর চাহিদাকে জাগিয়ে দিয়েছে। এর সাথে অংশীদারিত্ব মূলক ব্যবসায় যেন ম্যাচের বাক্সে বারুদ ঘর্ষণের কাজ করেছে। শিল্প বিপ্লব লাউগাছের মত ধীরে ধীরে বেয়ে বেয়ে অস্তিত্বে আসা শুরু করলে তা ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, মাল্টিন্যাশনালস, ভোট ও নোটের মাধ্যমে বিমূর্ত থেকে শরীরী রূপে আসতে শুরু করে। এই কারণে মানুষ পুঁজি একীভূতকরণকে চিরস্থায়ী জীবন ও আত্ম-নির্ধারণের উপায় বলে ভাবা শুরু করলো। চিন্তার স্বাধীনতা-শক্তিমানতা, মানবাধিকার, সংরক্ষিত মানবাধিকার, গ্রীন পিস, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির সকল কিছুর পিছনে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে পুঁজির একীভূতকরণ। আসলে বলা যায়, পুঁজির একীভূতকরণের জন্যই হিউম্যানিজমের বিভিন্ন উপায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানবতা ও চিরন্তনতা

তাদের ভাষায় নিয়ম কানুনের উর্ধ্বে থাকা নাকি মানুষের স্বভাবের একটি বুনিয়াদী বিষয়। এটাকেই তারা অধিবিদ্যা(Metaphysics) বলে সম্বোধন করে থাকে। অসীমের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণকে পূর্ণতা দান করার জন্যই মানুষ এযাবতকাল পর্যন্ত এত এত অসাধারণ কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়েছে। মানবেতিহাসে এ ধরণের তেমন কিছুই পাওয়া যায় না যে মানুষ এই কারণেই এত এত কিছু করেছে। এই চিন্তাধারার শুরু পশ্চিম থেকে। পশ্চিমারা কোনো ধরনের আইন-কানুন বা নিয়মের জিঞ্জিরে বিশ্বাসী নয়। তারা বলে মানবতার ইতিহাস এই জৈবিক দুর্ঘটনা থেকে আরো উর্ধ্বের বিষয় যাকে মৃত্যু বলা হয়ে থাকে। তবে মানুষ এই জীবনকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ করার প্রচেষ্টায় রত। এই কারণে এই লা-ফানাইয়্যাত বা অবিনশ্বরতা অর্জনের জন্য আমি যা করতে চাই তার জন্য আমার সময় দরকার। সেই সময় অবশ্য সেই সময় না যেই সময় চলে গেছে, বরং সেই সময় হলো যেই সময় আসতে চলেছে।

এই মধ্যবর্তী সময়ে এমন কিছু কাজে মগ্ন থাকা চাই বা এমন কোনো শখ পূরণ করা চাই যা আমার অন্তর্নিহিত সামর্থ্য, শক্তি, যোগ্যতা ইত্যাদিকে ব্যবহার করে এগুলোকে অটুট রাখবে। এই শক্তির ব্যবহারের রহস্য পুঁজিতেই লুকিয়ে আছে। পুঁজিই আমার শক্তিসমূহকে চিরন্তনতার দিকে নিয়ে যাবে। এরই অর্থ হলো অবাধ স্বাধীনতা

Scanned by CamScanner

যা তারা বুঝে থাকে। এই কাজই সেই সময় যা মত্যুর ও উর্ধ্বে। পুঁজি ও সময়ই আমার আকাঙ্খাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে এবং অনন্তের দিকে নিয়ে যাবে যাকে জীবন বলা হয়ে থাকে। এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। জীবনের আশা-আকাঙ্খা ও অনুভূতির এটাই নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য। যা পুঁজি কেন্দ্রীভূতকরণের মধ্যে একীভূত হয়ে গেছে। এই চিন্তাধারা জীবন-মৃত্যুর সাধারণ আবেদনকে অস্বীকার করে। মানবতাবাদীদের কাছে মৃত্যু ঘোর শত্রু, তাই এর বিরুদ্ধে অবিরত ও সর্বশক্তি ব্যয় করে, যাতে করে মানুষের মনে এই আশার সঞ্চার হয় যে একদিন সে মৃত্যুকে জয় করে নিতে পারবে, একদিন ফিতরাত বিবর্জিত সুপারম্যান হয়ে লা-মা'বুদিয়্যাতের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে যেতে পারবে, যাকে সে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে পারবে। তাদের কাছে অবিনশ্বরতার অর্থ এই যে জীবনের খাতা কোনোদিন বন্ধ হয়না, দেউলিয়া কেউ কখনো হয়না, কারো কোনো লোকসান হয়না। এই অবিনশ্বরতার চাহিদা তাকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে অধিকার ও শান্তি লাভ করা যায়। তাই সকলের উচিত জীবনকে কীভাবে ভালো থেকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এই চিন্তা করা। এই শান্তি তখনই সর্বোচ্চ হবে যখন মুনাফা বেশি হবে। আর মৃত্যু পরবর্তী জীবন! সে তো ধর্মের বাতলানো এক অদৃশ্য জগত, যা অবাস্তব, যার কোনো অস্তিত্বই বাহ্যদৃষ্টিতে নেই।

পশ্চিমা চিন্তাধারা বলতে সেই জীবন ও জীবনব্যবস্থা বুঝায় যা প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারা থেকে মর্ডানিজমের গতর বেয়ে পোস্ট মর্ডানিজমে এসে মোক্ষলাভ করেছে। এদের কাছে বিবেকই সকল সত্যের বড় সত্য। বিবেকের নরম মাটিতে এদের সভ্যতার বীজ বোনা হয়েছিলো। পশ্চিম বিবেকের একান্ত আরাধনায় মগ্ন বিভোর। এদের কাছে পঞ্চইন্দ্রিয়ের নাগাল পাওয়া মানেই তা সত্য। তাই স্রষ্টা ও আত্মার জগৎ তাদের সিলেবাস বহির্ভূত বিষয় যেহেতু তা বিবেকের লাইমলাইটে আসে না, যেহেতু তা বিবেকের বেদীর বাহিরের বিষয়, বিবেকোর্ধ্ব ব্যাপার স্যাপার। পশ্চিমে মানুষ এবং অধিকার শব্দ দুটি অন্য সকল কিছু থেকে অধিক গুরুত্ব রাখে। ভালো শুধু তাই যা মানবীয় খাহেশাতের অনুকূলে। যা মানুষের নফসের টলটলে নদী থেকে ভেসে আসে বা যে নফসের নদীর বুক চিরে স্বাধীনতার নৌকা সে ভাসাতে চায়। খাহেশাতপূজা (যাকে কুরআনে শিরক বলা হয়েছে) অনুযায়ী পশ্চিম কোনো ধর্ম, কোনো স্রষ্টা, কোনো নৈতিক মূল্যবোধ, কোনো ফিকহ, কোনো শরীয়ত, কোনো ওহী বা কোনো আইনকানুনের তোয়াক্কা করে না।

সে ইনসানের মা'বুদ হওয়ার দাবীদার। আর নফসকে সে একক উপাস্য বলে আত্মসমর্পণ করে। আর এই কারণে সে নফসের গোলামী করাকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করে। কুপ্রবৃত্তির অবৈধ আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থকরণই তাদের কাছে

Scanned by CamScanner

ভালো-মন্দের নির্ধারক। তাদের জ্ঞানের ভিত্তি ঈমানের উপর নয়, তাদের জ্ঞানের ভিত্তি ঘুটঘুটে অন্ধকারসদৃশ সন্দেহ। তাদের জ্ঞানের মূললক্ষ্য মানবতার কল্যাণ। ব্যক্তিপূজার মাথায় পৌঁছে ও এদের কাছে ব্যক্তিবোধের জ্ঞানই পৌঁছে না। ব্যক্তিত্ববোধের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত সভ্যতা এটা। এদের দুনিয়া ও কলব দুটোই আশ্চর্য জিনিস বটে। অন্তরকে আঁধারে ঠেলে দিয়ে স্রষ্টার প্রায়োগিক মৃত্যুর পক্ষপাতী এরা, তাই কোনো প্রকার নৈতিকতাকে মেনে নিতে তারা গররাজী। এদের কাছে ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য চারটি। (১) ধনসম্পদ; (২) আমদানী; (৩) শক্তি; (৪) স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। এসকল উপাদানই সাধারণভাবে জীবনের মূল্যবোধের নির্ধারক। এদের একটি শ্লোগান হলো 'ধর্মগত স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার' বেশ চিত্তাকর্ষক স্লোগান বটে। লিবারেলিজমের অন্যতম অগ্রপথিক জন রাউলস তার 'পলিটিক্যাল লিবারেলিজম' বইতে বলে,

> *"ধর্মগত স্বাধীনতাকে লিবারেলিজমের জন্য হুমকি হয়ে উঠার কোনো প্রকারেই অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। এই স্বাধীনতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা লিবারেলিজমের জন্য ঠিক তেমনই জরুরী যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে মেরে ফেলা জরুরী।"*

পশ্চিমা চিন্তাধারা বান্দাকে রব বলে মানে। সে মানুষের ঈশ্বর হওয়ার পক্ষপাতী, ইসলাম সেখানে উবূদিয়্যাত আর ইবাদাতের পক্ষপাতী। উবূদিয়্যাত আল্লাহর নৈকট্যের অন্যতম বড় দরজা। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বান্দা হওয়ার কারণে গর্ববোধ করতেন। তিনি এই মানবতাকেই উচ্চে তুলে ধরেছেন। তবে পশ্চিম মানুষকে আবদের জায়গায় রব হিসেবে মেনে নেয়। ইসলামে সে আল্লাহর বান্দা, এখানে সে নফসের বান্দা, বরং সে নিজেই রব। মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এ সকল দর্শন থেকে উদ্ভুত, ফলে আল্লাহর দেওয়া ফরয বিধান পিছনে পড়ে যায় এসব দর্শন পূজারীদের কাছে। এদের কেন্দ্র ইনসান আর ইসলামে কেন্দ্র আল্লাহ। ইসলাম খোদাপরস্তির, আর মাগরিব ইনসানপরস্তির।

Scanned by CamScanner

"তাঁরা হবে শেষ যমানার গুরাবা বা অপরিচিত, যা পূর্ববর্তী হাদীছসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যারা চারিদিকে বিভ্রান্তির কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে যাওয়ার সময় মানুষকে সংশোধন করার চেষ্টা করবে। মানুষ সুন্নাহের মধ্যে যে গড়বড় করেছে তা সংশোধন করবে। যারা ফিতনার কারণে নিজেদের দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে।"

প্রকাশিতব্য বইঃ শেষ যমানার মহানায়কঃ গুরাবা

মূলঃ ইমাম হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলী

Scanned by CamScanner

৫ম অধ্যায়

পুঁজিবাদ, সমতা ও সমধিকার

ড. জাভেদ আকবার আনসারী

অনুবাদঃ মিনারাহ ডেস্ক

যা থাকছে -

- পুঁজিবাদ ও মানবীয় অধিকার
- পুঁজিবাদ ও সমতার ভেঁপু

Scanned by CamScanner

পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম যে, পুঁজিবাদী কালিমা হলো 'লা-ইলাহা-ইল্লাল-ইনসান' অর্থাৎ, কোনো মা'বুদ নেই মানুষ ছাড়া। যার অর্থ হলো মানুষই একমাত্র ইলাহ্ এবং সে তার ও বিশ্বজগতের স্রষ্টা। ভালো-মন্দ মূলত মানবীয় প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাধীনতা স্বয়ংই ভালো, আর এই স্বাধীনতার মানে হলো মানুষ স্ব-নির্ধারণের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বাধাহীন-সীমাহীন। মৌলিকভাবে মানুষ স্বাধীন, মানুষের মধ্যে এমন যোগ্যতা আছে যা দ্বারা সে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিশ্বজগতের স্রষ্টা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে সে আবার স্বাধীন নয়, কিছু বস্তুগত ও সামাজিক বিধি-নিষেধ দ্বারা সে সীমা-পরিসীমায় বাঁধা। যেমন সে সৌরজগতের বাহিরে পালিয়ে যেতে পারে না, মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকতে পারে না, প্রবল তুফান মোকাবেলা করতে পারে না, মা-বাবা ছাড়া জন্ম নিতে পারে না, আমেরিকায় দুই স্ত্রী রাখতে পারে না, কিউবায় জমিজমা কিনতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসকল বস্তুগত ও সামাজিক বিধি-নিষেধ যা মৌলিকভাবে মানুষের স্বাধীনতার বিপক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এসকল বিপক্ষশক্তির সাথে সংগ্রামের নামই হলো পুঁজিবাদ। বাস্তবিক অর্থে মানুষ তার রবুবিয়্যাতের এই দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যও এর পক্ষে সংগ্রাম করতে বাধ্য। এই বাস্তবিক পরাধীনতাকেই মৌল স্বাধীনতা বলা হয়ে থাকে। কেননা পুঁজিবাদ মানুষের এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতি বিশ্বাস রাখার নাম, একেই তারা তাদের ভাষায় 'হিউম্যান' বলে অভিহিত করে থাকে। বস্তুত সকল মানুষ মূলনীতির দিক থেকে স্বাধীন হলেও বাস্তবিক অর্থে পরাধীন। একেই 'সাম্য' বলা হয়ে থাকে।

(ক) প্রত্যেক মানুষই তার স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবীতে সমান সমান;

(খ) প্রত্যেক মানুষই এই মূলনীতিগত স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য।

মানুষের স্বয়ংসম্পূর্ণতার মাধ্যম হলো পুঁজিবাদ। যে ব্যক্তিই মানুষের এই স্বয়ম্ভূত স্বাধীনতার তত্ত্বে বিশ্বাস করে সে এই পুঁজিবাদে অংশ নিতে বাধ্য। পুঁজিবাদ এই

Scanned by CamScanner

স্বাধীনতার (হোক মৌলগত বা ব্যবহারিক) মূর্ত প্রকাশ। যে ব্যক্তিই এই জীবনব্যবস্থাকে মেনে নিবে সেই পুঁজিবাদী। হোক সে মজুর, ম্যানেজার, জনপ্রতিনিধি, বা হোক সে বুদ্ধিজীবী বা অন্য কেউ। যে-ই মানুষের রবুবিয়্যাতের দাবীতে ঈমান আনে এবং সে বিশ্বাস করে মানুষ তার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য সেই পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদী রাজনীতি এই মৌল স্বাধীনতার ক্রমবৃদ্ধির জন্য যেই যেই মাধ্যম গ্রহণ করে থাকে তাকেই বলা হয় 'অধিকার'। যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকারই সমান, তারা এই অধিকারের মালিক ও একে অপরের সাথে এই দিক থেকে সমান। এসকল অধিকারসমূহ আবার দুই ভাগে বিভক্ত- (১) মানবাধিকার; (২) সামাজিক অধিকার। যা মূলত তিনটি চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে-

(ক) প্রাণাধিকার

এর দ্বারা বুঝানোর উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক নাগরিকেরই এই অধিকার আছে এবং তা তার জন্য আবশ্যকীয়ও বটে; সে স্বাধীন ও পুঁজিবাদী জীবনে নিজের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। যে এর ব্যতিরেকে করবে সে মূলত মানুষই (হিউম্যান) নয়, কেননা সে মানুষের স্বয়ংসম্পূর্ণ রবুবিয়্যাতের তত্ত্বকথায় ঈমান আনতে পারে নি। এই কারণেই সতেরো থেকে উনিশ শতকের মধ্যেই ৭০ মিলিয়ন রেড ইন্ডিয়ানকে হত্যা করা হয়েছে, আর বিখ্যাত দার্শনিক জন লক এই হত্যার বৈধতা দিয়েছে, ভেড়া আর রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা করা একই, কেননা ভেড়া যেমন মানুষ নয় তেমনি মানুষ নয় রেড ইন্ডিয়ানসরাও; দুই-ই আমেরিকার জমির উপর দখল করে নিয়ে সেখানে উন্নতি ও পুঁজিবাদের ক্ষতি করছিলো। এছাড়া বর্তমান যুগের রাজনৈতিক দার্শনিক ওয়ালজার আফগান মুজাহিদিনদের হত্যার বৈধতা দান করেছিলো কেননা ওয়ালজারের ভাষায় তারা মানুষ নয় বরং জানোয়ার গোছের কিছু একটা, যারা উন্নতির পথের কাঁটা।

(খ) মতপ্রকাশের অধিকার

প্রত্যেক নাগরিকের এই অধিকার আছে এবং তার জন্য আবশ্যকীয়ও বটে যে সে তার পুঁজি ও সমৃদ্ধির ক্রমবর্ধমানতার জন্য যা খুশি তা মত প্রদান করতে পারে, যদি সে স্বাধীনতাকে সর্বসম্মত ভালো হিসেবে মেনে না নেয় বা অন্য কোনো কারণে এই মতের (স্বাধীনতাকে ভালো না ভাবা) প্রকাশ ঘটাতে চায়, তবে তাকে এই অধিকার প্রদান করা যেতে পারে না কেননা সে মানুষ নয়। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই জন লক (John Locke) তার (A letter concerning toleration) গ্রন্থে বলেছে যে, মুসলিমদেরকে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার প্রদান করা যেতে পারে না কেননা তারা খ্রিস্টানদের মত ঈসাকে (আ) আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না এবং মানুষের

Scanned by CamScanner

স্বয়ংসম্পূর্ণতায় বিশ্বাস করে না।[1] এই মূলনীতির কারণেই মুজাহিদিনদের পক্ষাবলম্বন করা আমেরিকায় মহাঅপরাধ বলে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে।

(গ) রাইট অফ প্রপার্টি (Right of Property)

প্রত্যেক নাগরিকের ওপর আবশ্যিক যে সে তার সম্পত্তিকে পুঁজির হাওয়ালায় সোপর্দ করে দিবে, যদি এর ব্যতিক্রম ঘটে তো তার জন্য রিযকের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার জন্য ধনসম্পত্তি হাসিলও অসম্ভব হয়ে পড়বে। উদারবাদী পুঁজিবাদীরা এই নিয়মকে প্রত্যেক নাগরিকের উপর সমানভাবে প্রয়োগ করতে চায়, যেন প্রত্যেক নাগরিকই সেই সকল অধিকারের গন্ডিতে চলে আসতে পারে। একেই বলে (Rule of Law), আদতে তা বলা হলেও সেটি মূলত (Rule of law of Capital)। তবে পুঁজিবাদী দেশসমূহে এই বন্টন আবশ্যিকভাবেই ন্যায়বিচার ও সাম্যের বিপরীত হয়ে থাকে। কেউ সম্পদশালী তো কেউ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। কেউ হোটেল বয় আর কেউ তার চেয়ে ও নিচে, কেউ শক্তিসামর্থ্য ওয়ালা আর কেউ আনপড়, অশিক্ষিত। আর পুঁজির প্রবাহ অবশ্যই পুঁজি পুঞ্জিভূতকরণেরই আবশ্যিক অংশ, যারা বিভিন্ন জায়গা ও দেশ থেকে ডাকাতি করে তাদের সম্পদ বের করে নিয়ে এসে কিছু কর্পোরেশনে জমা করতে থাকে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেই না উন্নতি করতে থাকে সেই সাথে অসমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই মানবাধিকার এক সময় অধরায় পরিণত হয়। একজন রোজগারক্ষম লোক তার পুঁজি বাড়ানোর চেষ্টায় নিজের জান-মাল যতই ক্ষয় করার চেষ্টা করুক না কেন সে তা পারবে না, কেননা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উন্নতির সাথে সাথে এরকম উপার্জনক্ষম লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। একজন সাধারণ লোক তার মতামতের প্রকাশ কিভাবে করতে পারে? যেখানে মিডিয়ায় কেবল ৩০টা কোম্পানীরই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ অবস্থা। আর সাধারণ মানুষের মতামত প্রকাশের দায়িত্ব তো কোম্পানীরই হাতে। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ কিভাবে হতে পারে যখন তাদের সম্পদ মানি মার্কেট ও মূলধন বাজারে এসে জমা হতে থাকে? এই অবস্থায় হিউম্যান রাইটস এক কাল্পনিক

---

[1] That Church can have no right to be tolerated by the magistrate which is constituted upon such a bottom that all those who enter into it do thereby ipso facto deliver themselves up to the protection and service of another prince. It is ridiculous for any one to profess himself to be a Mahometan only in his religion, but in everything else a faithful subject to a Christian magistrate, whilst at the same time he acknowledges himself bound to yield blind obedience to the Mufti of Constantinople, who himself is entirely obedient to the Ottoman Emperor and frames the feigned oracles of that religion according to his pleasure. (John Locke, A Letter Concerning Toleration, pg: 36-35)- সম্পাদক

Scanned by CamScanner

জগত বলেই মনে হয়।

এই বৈষম্যকে কমানোর জন্য প্রাচ্যের পুঁজিবাদী বুদ্ধিজীবী ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা সামাজিক অধিকারের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয় যেখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো পারস্পরিক দরকষাকষির অধিকার (Right of collective bargaining)[1]। প্রাচ্যের পুঁজিবাদী বিশেষজ্ঞ ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা এই বিষয়ে একমত যে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমশক্তির বন্টনেই পুঁজিবাদী বৈষম্য সবচেয়ে বেশি প্রকট আকার ধারণ করে থাকে। আর সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ম্যানেজমেন্টের সামনে একেবারেই দুর্বল সে যখন চায় তখন তাকে বেরোজগার করে দিতে পারে। এই কারণে ম্যানেজমেন্টের কাজে শ্রমিক ইউনিয়নকে অংশীদার ও তাদের বেতন-মজুরী নির্ণয়ে তাদের সিদ্ধান্তের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। প্রাচ্যবাদী পুঁজিবাদরা যেখানে আর্থিক মামলায় রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনগুলোর আধিপত্যের উকালতি করেছে সেখানে সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা রাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ করেছে তারা যেন এমন একটি কল্যাণমূলক অধিকার নির্ধারণ করেন যেন প্রত্যেক নাগরিকই ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান উন্নতি করতে পারে।

এই সকল সামাজিক ও মানবাধিকারের অর্থ হলো নাগরিকদের এমন যোগ্য করে তোলা যাতে করে তারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে তাদের সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটাতে পারে, যার মাধ্যমে প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত খাহেশাতে নফসকে পূরণ করতে পারে। এটাই পুঁজিবাদী ন্যায়বিচার। এই ন্যায়বিচার তো সরাসরি যুলম। আফসোসের কথা হলো অনেক ইসলামী জামায়াতও এসকল পুঁজিবাদী ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম সাধনা করে থাকেন। যারা মানবাধিকার ও সামাজিক অধিকারের উকিল হয়ে বসেছেন, আর সেগুলোকে ইসলামী শরীয়াতের উদ্দেশ্য ভেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তারা বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন নি যে এসকল অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাজের অন্তর্ভুক্ত, আর এই সকল পুঁজিবাদী অধিকারের পরিষ্কার প্রতিবাদ, খন্ডন ছাড়া বর্তমান হালতে না দ্বীনের হেফাজত সম্ভব না দ্বীনের বিজয়। পুঁজিবাদী বিশ্বাস, স্বাধীনতা, সমতা আর উন্নতির এ সকল ধারণাকে ইসলামী বানানোর প্রচেষ্টা এক ধরনের রিভিশনিস্ট আন্দোলন যা পুঁজিবাদী এজেন্ডার বাস্তবায়ন করে এদেরকে পুঁজিবাদী এজেন্ট বানানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

[1] "Collective bargaining is a key means through which employers and their organizations and trade unions can establish fair wages and working conditions, and ensure equal opportunities between women and men. It also provides the basis for sound labour relations. Typical issues on the bargaining agenda include wages, working time, training, occupational health and safety and equal treatment." (https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/freedom-of-association/lang--en/index.htm)- সম্পাদক

Scanned by CamScanner

"ঈমান ও ইসলামের পথের দূরত্ব মূলত এক, তবে এদের পার্থক্য সূচনা আর পরিসমাপ্তির স্থান নিয়ে। ঈমান শুরু হয় অন্তরে এবং শেষ হয় বাহ্যিকভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুগত্য পোষণের মাধ্যমে, আর ইসলাম শুরু হয় বাহ্যিক আনুগত্য দিয়ে আর শেষ হয় অন্তরে যেয়ে। যেই সত্যায়ন ইসলাম পর্যন্ত পৌঁছে না সেই ঈমান আর যেই ইসলামের আনুগত্য অন্তরের সত্যায়নের নাগালে আসে না এ দুটির একটি ও গ্রহণ করা হবে না।"

প্রকাশিতব্য বইঃ ঈমান ও কুফর

মূলঃ মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী(রাহি)

Scanned by CamScanner

৬ষ্ঠ অধ্যায়

হিউম্যানিজম ও স্বাধীনতার যথেচ্ছা ব্যবহার

মিনারাহ ডেস্ক

যা থাকছে-

- হিউম্যানিজম কি?
- হিউম্যানিজম ও পশ্চিমা সভ্যতা

Scanned by CamScanner

সাধারনভাবে '**হিউম্যান**' শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হয় মানুষ হিসেবে। যার দ্বারা বোঝানো হয় মানুষ তো মানুষই, হোক সে প্রাচ্য বা পশ্চিমের। কিন্তু ব্যাপারটি কি এত সহজ? না মোটেও নয়। বেশ ঝামেলা আছে।

প্রত্যেক সভ্যতা আর জীবনব্যবস্থারই কিছু স্বতন্ত্রতা আছে, আছে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্রতা নির্ধারণের অন্যতম একটি বুনিয়াদ হচ্ছে 'আমি কে?' এই প্রশ্নটি। জীবনের উদ্দেশ্য, ভালোমন্দের সংজ্ঞা এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে মূল এই প্রশ্নটির উত্তরে। সাধারণভাবে ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, প্রায় প্রতিটি যুগেই এই প্রশ্নের উত্তর ছিলো 'আমি একজন দাস বা কারো আজ্ঞাবহ'। বহুকাল পরিক্রমায় এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই মানবতা বলে ধরা হত। তবে প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো সেই সঙ্গে এই ভিন্ন উত্তর দেওয়া লোকসভ্যতার ও অস্তিত্ব সেই সময়ে ছিলো। তবে তা আধিপত্য বিস্তার করার মত ছিলোনা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন এনলাইটমেন্ট আন্দোলন শুরু হয় তখন এক পরিবর্তনের হাওয়া লাগতে শুরু হয় ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানে। এই পরিবর্তন বেশ শক্ত ভিত দখল করে নিলো। ফলে 'আমি কে?'[1] এই প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারে এক নতুন উত্তর পাওয়া যাচ্ছিলো। সেই উত্তর হলো আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ (autonomous)। ব্যক্তিসত্ত্বার ব্যাপারে এমন নতুন গোড়াপত্তনের ইঙ্গিত "I think, therefore I am" উক্তিতে পাওয়া যায়।

যা অনুসারে প্রতিটি মানবসত্ত্বাই সৃজনশীলতার অধিকারী। এছাড়াও সে সবধরনের সন্দেহ ও সংশয় থেকে উর্ধ্বে জ্ঞানের ফল্গুধারা। যাকে তারা একক সত্ত্বা 'আমি' বা 'I' দ্বারা প্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তিসত্ত্বার এই স্বাধীন ও স্বয়ংশাসিত দৃষ্টিভঙ্গি

---

[1] এই প্রশ্নের উপরই দাঁড়িয়ে আছে 'ontology' নামক জ্ঞানের সম্পূর্ণ পৃথক একটি শাখা, যেখানে সত্ত্বার প্রকৃতাবস্থা নির্ণয়ের জোরদার চেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু ....'ontology' সম্পর্কে জানতে দেখুন দর্শনকোষ পৃ-৩০০।- সম্পাদক

Scanned by CamScanner

আলোকপ্রাপ্ত (enlightened) চিন্তাধারা নামে পরিচিত। নিজের দাসত্বের মোচন ও অন্তর্নিহিত অসীমত্বের দাবি করা ও ঈশ্বরের বিদ্রোহী সত্ত্বাই হলো তাদের মতে হিউম্যান (Human)।

বিখ্যাত পশ্চিমা দার্শনিক ফুকো বলেন, "হিউম্যান মানবেতিহাসে সপ্তদশ শতকেই প্রথম জন্ম নেয়"। ফুকোর কথার অর্থ কিন্তু এমন নয় যে এর আগে দুনিয়াতে মানুষের অস্তিত্ব ছিলোনা। বরং তার কথার উদ্দেশ্য হলো যেখানে আগে মানবতা বলতে একধরনের ধর্মীয় চেতনার আভাস পাওয়া যেত, সেখানে সপ্তদশ শতকেই প্রথমবারের মত 'হিউম্যান' সত্ত্বার পরিচয় সামনে আসে। মানবসত্ত্বার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করেই হিউম্যানিজম গড়ে উঠেছে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবিক সত্ত্বার গুণাবলীর পালে বাতাস লাগানো অর্থাৎ, বাস্তবিকরুপেই স্বয়ংশাসন (autonomy) ও আত্মনির্ধারন (self-determination) কেই জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহন করতে মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করা।

এইসব বিষয় আলোচনা করতে গেলে আবশ্যিকভাবেই স্বাধীনতা শব্দটি বারবার উঠে আসে। তাই এই বিষয়েও কিছু আলোচনা করে নেওয়া যায়। স্বাধীনতা কি?

আমরা এখানে অবস্থাবিহীন স্বাধীনতার পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি। দৃষ্টিভঙ্গিজনিত ও অভিধানগত স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বাধীনতার অভিধানগত অর্থ অনেকটা এরকম- আপনার কিছু করার ক্ষমতা আছে, আপনি এই ক্ষমতার প্রয়োগ বিষয়ে কারো অধীন নন। যেমন পশু কাজকর্ম করতে পারে তাই সে এইদিক থেকে স্বাধীন, তারা কথা বলতে পারেনা তাই এদিক থেকে আবার তারা স্বাধীন নয়। অভিধানগত ভাবে স্বাধীনতা একটি গুণ এবং একটি নির্দিষ্ট শক্তির নাম। যেমন শ্বাস নেওয়ার শক্তি, খানা খাওয়ার শক্তি ইত্যাদি।

কিন্তু এখানকার আলোচনার বিষয় হলো দৃষ্টিভঙ্গিজনিত স্বাধীনতা। যার জন্মস্থান ইউরোপ। দুজন লোকের এর পিছনে বড় ভূমিকা আছে বলে ধরা হয়। (১) ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী রেনে ডেকার্টে (Rene Descartes); (২) জার্মান দার্শনিক ইমানুয়্যাল কান্ট (Kant)। তাদের ভাষায় মানব অস্তিত্বের এই প্রমাণ এই যে তারা ভাবনা-চিন্তা করতে সক্ষম। ডেকার্টের বিখ্যাত উক্তি (I Think therefore I am.) এবং কান্ট বলেছে যে, মানুষের মস্তিষ্ক পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটি ধারণা বা তত্ত্বের আকার দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন। যেহেতু সকল মানুষের মস্তিষ্কের গঠন একই, তাই সকল মানুষ একই ধরণের ক্ষমতা রাখে। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে নিজেই বিবেক দ্বারা সত্য জানতে পারে, তাই সত্য জানার জন্য সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। সে নিজেই

Scanned by CamScanner

স্বয়ংসম্পূর্ণ, যে নিজের বিবেককে সত্য জানার জন্য পথনির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। আর ধর্মগত ধ্যান-ধারণার কোনো জ্ঞানগত ভিত্তি নেই। জ্ঞান তাই যার নাগাল পঞ্চেন্দ্রিয় পেতে পারে। এসব ছাড়া সকল কিছুই জ্ঞানের সীমা বহির্ভূত। যার কোনো প্রয়োজন মানুষের জীবনের ভালো, মন্দ, মানব সম্পর্কিত তথ্যের উপলব্ধি ও সমস্যা সমাধানের জন্য নেই। এ কারণেই সকল মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীন। যে এর ব্যবহার করবে না সে কান্টের ভাষায় নাবালেগ বা অপরিণত বাচ্চা। সবাইকেই স্বাধীন হওয়া চাই। ভালোর নির্ধারনের জন্য শুধুমাত্র নিজের উপর নির্ভর করা উচিত। জীবনব্যবস্থা এমনই হওয়া চাই যাতে করে মানুষের এই অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার উপলব্ধি মানুষের থাকে এবং সে নিজের বিবেকের ফয়সালার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করতে পারে। সে (কান্ট) তার হামসফর দার্শনিক ডেভিড হিউমের এই কথার সাথে একমত পোষণ করেছিলো যে বিবেক সকল খাহেশাত পূরণের শর্ত পূরণ করে। **নির্ধারণী বা আলোকপ্রাপ্ত বিবেক মতে বুদ্ধিবৃত্তি খাহেশাতের অসীম প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থার অনুমতি দেয়। সে যা চায় চাইতে তাই পারে। কোনো কাজই স্বতঃ ভালো-মন্দ, বা হালাল-হারাম নয়। সব কিছুই চলে যদি মানুষ চায়।**

তবে শর্ত এই যে কাজ করার ফলাফলের কারণে যাতে নিজের পছন্দসই কাজ করার এই অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত না হয়। যাকে Principle of Universalizability বলা হয়। এই কারণে চুরি করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না, কারণ কেউ চায়না যে সবার চুরি করার অনুমতি থাকুক। কেননা এতে চোরের নিজের সম্পত্তিও চুরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু উভয়ের সম্মতিক্রমে শারিরীক মিলন করা যাবে যেহেতু এর মাধ্যমে অপর মানুষের শারিরীক মিলনের ইচ্ছা জেগে ওঠে না। তাই এটা একটা Universalizable এবং খুব ভালো কাজ।

অনেকে বলে থাকেন যে ইসলাম ও নাকি স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ইসলামই নাকি মানুষের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। কিন্তু যারা এই কথা বলে থাকেন তারা হয় জেনেবুঝেই ইসলামকে পশ্চিমাকরণ করতে ইচ্ছুক অথবা তারা আসলে স্বাধীনতার অর্থই বুঝতে সক্ষম হননি। কেননা এখানে স্বাধীনতা বলতে অভিধানগত স্বাধীনতাকে বুঝানো হচ্ছে না মোটেও। এখানে নীতিনির্ধারনের স্বাধীনতার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। **আর নীতিনির্ধারণের স্বাধীনতা বলতে মানুষের স্বয়ংশাসন ও আত্মনির্ধারণের ক্ষমতাকে ভালো, মন্দ, ঠিক, বেঠিক ইত্যাদি নির্ধারনের মৌলিক বা চূড়ান্ত মাপকাঠি ও স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গন্য করাকে বোঝায়।** সহজভাবে এই স্বাধীনতা বলতে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতার মাপকাঠিতে মাপাকে বোঝায়। যাতে কোনো দ্বিতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ থাকবেনা। **আর ভালো মত বুঝা দরকার যে পশ্চিমা ডিসকোর্সে স্বাধীনতা বলতে উপরোক্ত**

Scanned by CamScanner

স্বাধীনতাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তারা যখন স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে মুখে ফেনা উঠিয়ে ফেলে তখন তারা মোটেই অভিধানগত স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে না বরং তারা তাদের সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে সেই স্বাধীনতাকেই বোঝায় যার আলোচনা একটু আগে করা হয়েছে। ভালোমত মনে রাখা প্রয়োজন মানবাধিকার, হিউম্যান রাইটস, বাকস্বাধীনতা ইত্যাদির ধারণাও কিন্তু মানুষের এহেন সংজ্ঞা থেকেই উদ্ভূত। কেননা তারা মানুষ বলতেই এমন কিছুকেই বোঝায় যা সকল বাধা-গন্ডীর উর্ধ্বে ও বাহিরে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে দেশীয় ও বিদেশীয় মুক্তমনা-ফ্রি থিংকাররা যখন স্বাধীনতার কথা বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলে তখন তারাও স্বাধীনতা বলতে এমন কিছুকেই বোঝায়। কিন্তু অনেকেই বিষয়টি বুঝতে ভুল করে একে অভিধানগত স্বাধীনতার অর্থে ধরেন।।

কিন্তু ইসলামে এই ধরনের স্বাধীনতা মোটেও নেই। ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবর্তে আছে আবদিয়্যাত। যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছাই চূড়ান্ত, তাঁর দেওয়া স্ট্যান্ডার্ডই চূড়ান্ত। বান্দা কী চায় না চায় তা মূলত জরুরী নয় বা এর থেকে অধিক জরুরী হলো আল্লাহ্‌র আদেশ আর নিষেধ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

www.ilhaad.com

www.rejectingfreedomandprogress.com

Scanned by CamScanner

"পশ্চিম কোনো ব্যাপারেই একক সমাধান পেশ করতে সক্ষম হয়নি। উপচে পড়া বৈপরীত্যে ফেঁসে থাকা যেন পশ্চিমের বৈশিষ্ট্য। যতই কোনো একক সমাধান উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে ততই যেন ব্যর্থতার ঝুলি ভারি হয়েছে। এর কারণ হলো, পশ্চিম বস্তুতে ও বস্তুবাদে সমাধান খুঁজতে গিয়েছে, ফলে বিশৃঙ্খলা, অগণিত বৈপরীত্য আর বিক্ষিপ্ততা ছাড়া আর কিছুই মেলে নি। তারা ব্যক্তি আর সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে যেয়ে দিশেহারা-দিকহারা হয়ে গিয়েছে।"

প্রকাশিতব্য বইঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও এর বিভ্রান্তির ইতিহাস

মূলঃ মুহাম্মাদ হাসান আসকারী

Scanned by CamScanner

৭ম অধ্যায়

প্রাচ্যবাদী চশমা

মূলঃ মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী
ইংরেজী অনুবাদঃ ওয়াসিম আকবার চীমা
বাংলা অনুবাদঃ মিনারাহ ডেস্ক

যা থাকছে-

- প্রাচ্যবাদ
- পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগনের নিকট রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবস্থান

Scanned by CamScanner

যদিও লেখাটি শতাব্দী পুরোনো, কিন্তু এর আবেদন বর্তমানেও আছে। কার্লাইলের লেখনীতে যে অসংগতি ছিলো তা বর্তমানে ক্যারেন আর্মস্ট্রং ও লেজলি হাজল্টনের লেখনীতে একই রকমভাবে দেখা যায়। আশা করি এই প্রবন্ধটি বহুল প্রচারিত ও প্রসারিত উন্নত পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তি, উন্নতি, ও প্রাচ্যবিদদের আসল চেহারা উন্মোচন করবে, আগাগোড়া ভুলে পূর্ণ তাদের অভিযোগসমূহ, মৌলিক সমস্যাবলী ও তাদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ ও পরিষ্কার করে দিবে, যারা মুসলিমদের অগোচরে তাদের মন-মগজে বিষাক্ত ছোবল বসিয়ে যাচ্ছে। [১]

জর্জ ফিনলে মধ্য উনিশ শতকের একজন ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ (ওরিয়েন্টালিস্ট), তিনি ইউনিভার্সিটি অফ গটিজেন থেকে এম.এ এবং এল.এল.বি সমাপ্ত করেন। তার বিশেষ আগ্রহ ছিলো গ্রীসের ইতিহাস নিয়ে। ১৮২৬- ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের মাঝে তিনি গ্রীসের ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেন। ১৮৪৪ সালে তার একটি বই প্রকাশিত হয় যার নাম ছিলো " Greece under the Romans", যা উক্ত বিষয়ে একটি প্রামান্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। বইটি ইসলামের আবির্ভাবের সমসাময়িক ইতিহাস নিয়ে রচিত। আর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময় গ্রীস রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্ত একটি প্রদেশ ছিলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাদের সাথে রোমানদের প্রথমদিকের যুদ্ধগুলো গ্রীসে সংঘটিত হওয়ায় ইসলাম ও প্রাথমিক মুসলিমদের ব্যাপারে উক্ত গ্রন্থে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। না রচয়িতার ইসলামের সাথে কোনো বিরোধ ছিলো, আর না গ্রন্থটি ইসলামের বিরোধিতা করে লেখা হয়েছে; তবুও তা একজন প্রাচ্যবিদের হাতের ফসল। পরবর্তী আলোচনায় বোঝা যাবে কীভাবে বিরোধিতার উদ্দেশ্যহীন লেখাগুলোতে ও ইসলামকে বিকৃত আর বিকলাঙ্গ করে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কিভাবে তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ইসলামকে পরোক্ষ ভাবে আক্রমন করার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাবের

Scanned by CamScanner

পূর্বেই গুটিকয়েক লোক একত্ববাদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিলো। তবে লেখক ফিনলে কল্পনার ডানায় ভর করে লিখে দিলেন যে আরবে পূর্ব থেকেই নাকি পরিবর্তনের হাওয়া বইছিলো! তিনি লিখেন,

> *"এটা বলা যায় যে, আরবরা ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই নৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি লাভ করছিলো এবং সেই সময় তাদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পথ পরিক্রম করছিলো। শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের পতন তাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে এবং তা থেকে উত্তরোত্তর মুনাফা বৃদ্ধি ও সঞ্চয় সংগ্রহ এবং তাদের স্বকীয় ও জাতীয় ঐক্য-সংহতি সম্পর্কে সূদুরপ্রাসারী ও সচেতন করে তুলেছিলো। যা উক্ত শতাব্দীতে আরবের জনগনের মধ্যে শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিলো, এই সময় হিরাক্লিয়াস ক্ষমতায় আসে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ও নজরকাড়া বিষয় এই যে মাহমেত রাজা দ্বিতীয় জাস্টিনের সময় জন্মগ্রহন করেছিলো, আর তিনি এই সময় জাতীয় ঐক্যের শিক্ষায়ই শিক্ষিত হয়েছিলেন"!!* [২]

হতাশা আসলেই কখনো কখনো অদ্ভুত ধারনার উদ্ভব ঘটায়। লেখক নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অলৌকিক কর্মকান্ড সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, তাই একে কিভাবে ধামাচাপা দেওয়া যায় তারই চেষ্টা বলা যায় একে। লেখক সম্ভবত দ্বিধাগ্রস্থ যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঠিক কোন দিকটা নিয়ে আলোচনা করবেন? ধর্মীয় নাকি রাজনৈতিক!। নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মূলত রাজনৈতিক মিশন ছিলো যাতে করে আরবের গোত্রগুলোকে একত্রিত করে একটি জাতীয় মৈত্রীবোধের ভাব তৈরী করতে পারেন; এমন মতই লেখক তার লেখার শেষদিকে ব্যক্ত করেছেন। যে কেউই লেখকের এমন উপস্থাপনায় তাজ্জব না হয়ে পারবেইনা!

যদি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিশন শুধুমাত্র রাজনৈতিক মৈত্রীই হত তাহলে কী প্রয়োজন ছিলো মূর্তিপূজার বিরোধিতা করার, আর একে মিটানোর জন্যে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ করার? কীসের প্রয়োজন ছিলো কিছু নির্দিষ্ট বিশ্বাসের আর নতুন প্রার্থনার নিয়মের? বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়ার দাবীর সততার খাতিরে হলেও ফিনলের উচিত ছিলো ইসলাম পূর্ব এমন কোন আন্দোলন বা সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের উল্লেখ করা যাতে করে সেই পরিবর্তনের হাওয়া পাঠকদের গায়েও কিছুটা লাগত! তবে তিনি তা করেননি। আর লেখকের উদ্দেশ্য যদি এই হত যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আন্দোলন/সংস্কার যদিও ধর্মীয় ছিলো তবে তার ভিত্তি পূর্ব থেকেই গঠিত হয়ে গিয়েছিলো তবুও লেখকের উচিত ছিলো এমন কিছু সংস্কারকদের নাম উল্লেখ করে দেওয়া, যাতে এতটুকু অন্তত অনুমান করা যেত যে

Scanned by CamScanner

কতটুকু গাঁথুনি আগেই গড়ে উঠেছিলো আর ইসলাম এসে সেই গাথুনির উপর কতবড় ইমারত তৈরী করেছে!

আসল কথা হচ্ছে, ইবনে হিশাম ৪ জনের নাম উল্লেখ করেছেন যারা পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজায় অতীষ্ঠ হয়ে তা ত্যাগ করে সত্য ইব্রাহিমীয় একত্ববাদের সন্ধানে দিন অতিবাহিত করছিলো। যাদের দুজন পরবর্তীতে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলো।[৩] তন্মধ্যে একজন ধর্মের পর ধর্ম পরিবর্তন করে যাচ্ছিলো।[৪] এবং তাদের মধ্যে একজন মাত্র একত্ববাদী বিশ্বাসের ওপর অটল থাকেন।[৫] একেই কি ভিত্তি বলে? এমন কোনো যুগ কি ছিলো যে যুগে এমন মুষ্টিমেয় কিছু সত্যসন্ধানী মানুষ ছিলো না? কিন্তু দেখার বিষয় হচ্ছে আরবের অধিকাংশ কি এইসব মুষ্টিমেয় লোকদেরকে গ্রহন করেছিলো? খ্রিস্টানবাদ বা ইহুদীবাদ বা অন্য কোনো ধর্মের লোকও কি গ্রহণ করেছিলো? না সূচক উত্তর শুধু মুসলিমদের থেকেই নয় বরং অমুসলিমদের থেকেও পাওয়া যায়। এমনকি (কুখ্যাত) প্রাচ্যবিদ ম্যুর এমনটাই লিখেছেন, তার ভাষায়,

> *"মুহাম্মাদের যৌবনকালে আরবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিলো অতি রক্ষনশীল। হয়ত পূর্বের যেকোনো সময় হতে সংস্কারের আশা অধিক ক্ষীণ দেখাচ্ছিলো। কখন কখনো কোনো আশা যদিও বা দেখা যেত তা সংস্কারের জন্য অপর্যাপ্ত ছিলো। মুহাম্মাদের আবির্ভাব হলে সাথে সাথে আরব নতুন এক আধ্যাতিক বিশ্বাস দ্বারা উজ্জীবিত হলো। তাই, আরব বা আরবগোষ্ঠী এক পরিবর্তনের অপেক্ষা করছিলো বা তারা পরিবর্তনকে মেনে নিতে আগ্রহী ছিলো ইতিহাস বিশ্লেষণে এমন ধারণা মিথ্যা বলেই মনে হয়।"* [৬]

মুসলিমদের কাছে হিরাক্লিয়াসের পরাজয় ইতিহাসের অন্যতম এক মাইলফলক। একপক্ষে ছিলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যুদ্ধে পারদর্শী ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী অভিজ্ঞ যুদ্ধবিদ, বিপুল সম্পদ, দক্ষ সেনাদল ও প্রচুর রসদপত্রের আশীর্বাদপুষ্ট এক জাতি; অপরপক্ষে সামান্য অস্ত্রাদি, সাথে কোনো প্রকার কলা বা বিজ্ঞানের জ্ঞানে অপরিপক্ক ও যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ এক জাতি। তবুও বিজয়মালা দ্বিতীয় দলের গলায়ই পরিয়ে দেওয়া হলো। উক্ত ব্যাপারকে লেখক যেভাবে বর্নণা করেছেন,

> *"হিরাক্লিয়াস যখন পূর্বদিকে তার রাজত্বের শক্তি বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় শক্তিগুলোকে একত্রিত করতে ব্যস্ত ছিলো-যা মানব ইতিহাসের অন্যতম বড় ভুল-সেই সময় মাহমেত মানবমনের স্বভাবজাত ঐক্য পরবর্তী তাড়নায় গোটা আরবকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করতে এবং একটি মাত্র ধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করতে সফল হয়েছিলো।"* [৭]

বাহ! হিরাক্লিয়াস শতাব্দী পুরোনো বিশাল সাম্রাজ্য, সম্পদের প্রাচুর্য আর বিভিন্ন বিষয়ের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলে তা "মানব ইতিহাসের অন্যতম বড় ভুল", আর যখন সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে যোজন যোজন দূরের আরবের

Scanned by CamScanner

অক্ষরজ্ঞানহীন, দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন একজন অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করে তাদের আচার-বিশ্বাস পর্যন্ত সংস্কার করে ফেলে তা হয়ে যায় কোনো অতিমানবীয় বা নবুওয়াতের বল ছাড়াই! এই কি তবে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-রচনা আর আলোকিত পান্ডিত্য! বাহ! এতেই পশ্চিমাদের ইসলাম ও নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে সামান্য হলেও আঁচ পাওয়া যায়। লেখক খ্রিস্টান মিশনারী বা কোনো পুরোহিত নন বরং ইতিহাসের জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত একজন ব্যক্তিত্ব। তার লেখার বিষয় ইসলাম নয় বা ইসলামকে কটাক্ষ করেও তা লেখা নয়, বরং তা গ্রীসের ইতিহাস নিয়ে লেখা, যেখানে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় ইসলাম ও নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলোচনা এসেছে। সাধারণ পাঠক হয়ত লেখক সম্পর্কে তেমন খারাপ ধারণা ও করতে পারবেনা যেহেতু এতে রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবদান ও কীর্তি নিয়ে আলোচনা আর প্রশংসাও করা হয়েছে। তবে তার রচনার ভঙ্গি তাকে একজন সত্যনবী বা রিসালাতের ধারক হিসেবে তো নয়ই এমনকি সাধু হিসেবেও নয় বরং অসাধারণ একজন বুদ্ধিদীপ্ত ও সফল রাজনৈতিক নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছে (নাউযুবিল্লাহ)।

তাঁর নবীওয়ালা কৃতিত্বগুলোকে “মানব প্রকৃতির উত্তম তত্ত্বাবধায়ন” বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন সাধারন মুসলিম যিনি লেখকের বাস্তববাদী, কথিত নিরপেক্ষতা ও পান্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপনা ইত্যাদি চটকদার কথায় ভুলে যান তারাই লেখকের খপ্পড়ে পড়েন। এখানে লেখক নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণ একজন বিজেতা ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে রুপায়ন করতে চেয়েছেন। খ্রিস্টান মিশনারীদের আক্রমন গুলো সরাসরি ও স্পষ্ট হলে এই কালসাপদের বিষ যেন পিছন থেকে ছুরি বসিয়ে দেওয়ার মতোই। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যতম মুজিযাহ ও কাফিরদের বিপক্ষে প্রমাণস্বরুপ। কাফিররা অনেক সময়ই মুজিযাহ দেখানোর জন্য বলত। আর তাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় ছিলো একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ। এমন জাজ্বল্যমান বিজয়কে তারা অস্বীকার করতে পারত না। পূর্বেকার কাফিররা মুজিযাগুলোকে জাদু বলে অস্বীকার করত, আর বর্তমানকালের পাষন্ডগুলো ভাষার চমকে পাঠককে ঘোল খাওয়ানোর চেষ্টা করে। ফিনলে ইসলামের বিজয় সম্পর্কে মত দেয় এভাবে,

> *“অবাক হতে হয় খশরুর পারস্য ও হিরাক্লিয়াসের রোমান সাম্রাজ্যের পরিবর্তন দেখে, তাদের পূর্বেকার বিপুল শক্তিমত্তা যেন আরবের নবী মাহমেতের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নতুন রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের প্রভাবে ধুলোর সাথে মিশে গেলো”*[৭৮]

Scanned by CamScanner

এখানে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অর্জনকে স্বীকার করা হয়েছে ,স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁর বিপ্লব ছিলো অপ্রতিরোধ্য, যার সামনে সমসাময়িক পরাশক্তি রোম ও পারস্যও টিকতে পারেনি। তবে সমস্যা হলো যে এতসব কৃতিত্ব নবুওয়াতের বলে নয় বরং তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, উদ্ভাবনী কৌশলের বলে অর্জিত হয়েছে। ফিনলে লিখেন,

> *"এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন আইনপ্রনেতাদের মধ্যে মাহমেতের (মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফল্য হলো তার মতবাদ একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক সময় পর্যন্ত টিকে ছিলো, সামাজিক রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর নিদর্শনই প্রমান করে যে মাহমেত লাইকারগাস ও আলেক্সান্ডারের মত ব্যক্তিত্বদের গুণসমূহের সমন্বিত এক বিরল ও দুর্লভ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলো।"[৭১]*

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা তাদের দৃষ্টিতেও অনস্বীকার্য। তার সংস্কারও ছিলো মনোমুগ্ধকর। তবে সে তাঁর দাবীতে সত্যবাদী এমনটি ভাবার কোনোই কারণ নেই! তার (ফিনলে) মতে রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফল্যের মূল রহস্য হলো তার মধ্যে পূর্বেকার বিজেতা ও আইনপ্রণেতাদের সমন্বিত গুনাবলী!!! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে আবু জাহল মুজিযাহ দেখে চমকপ্রাপ্ত হলে হীন মানসিকতার জন্য "এই লোক তো জাদুকর" বলে রাসুলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্বীকার করত।

নবুওয়াতকে অস্বীকার করার বাহানাগুলোর মধ্যে কতই না মিল! আবু জাহলি মানসিকতার পুনর্জাগরণ! পৃথিবীর কোন বিজেতা এত ক্ষীণ সংস্থান নিয়ে বিজয় লাভ করেছিলো? আলেক্সান্ডার? নেপোলিয়ন? চেঙ্গিস খান? কে? আর কোন সেনাবাহিনী এত অপরুপ, মনোরম, আকর্ষনীয় ও উত্তম চরিত্রের প্রদর্শন করতে পেরেছে? আর কোন লোক এত উত্তম লোকদের নেতা ছিলো? কোন সেনাবাহিনী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দিনে সিয়াম রেখে নিজেদের ক্ষুধাকে নিবারণ করে আর রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের ক্লান্ত করে সংখ্যায় নিজেদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ও শক্তিশালী সৈন্যের সাথে লড়াই করেছে? আর কোন আইনপ্রণেতা মানবপ্রকৃতির সাথে এত অপূর্ব সমন্বিত আর জীবনঘনিষ্ঠ জীবনবিধান দিতে সক্ষম হয়েছে? সকল জাগতিক চাহিদার উর্ধ্বে এসে কে এমনভাবে সত্য-ন্যায়, আত্মশুদ্ধি ও মহত্ত্বের মাপকাঠি তুলে ধরতে পেরেছে? লেখকের কি সামান্য লজ্জাও হয়নি এমন এক মহৎ চরিত্রের অধিকারীকে সামান্য ও তুচ্ছ বিজেতা আর আইনপ্রণেতাদের শামিল করতে? এই যদি হয় গবেষণা তবে মূর্খতা কি জিনিস?

লেখক রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসামান্য ব্যক্তিত্বের

Scanned by CamScanner

প্রশংসাও করেছেন, তবে এতে করে যাতে নবুওয়াত প্রমাণিত না হয়ে যায় এই কারণে সে লিখে দিয়েছে,

> *“মাহমেত যেই সময়ে বসবাস করেছিলো তা তার ব্যক্তিত্ব গঠন করতে সাহায্য করেছিলো, এই কারণেই সে এত গভীর প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। সে সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক পতনের একটি সময়ে জন্ম নিয়েছিলো। বিদ্যমান সময় থেকে উন্নত কিছুর জন্য মানুষের স্বাভাবিক তাড়না প্রায় প্রতিটি দেশের নাগরিকদের ভেতরেই তৎকালীন সামগ্রিক ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিলো। পৌত্তলিকতা থেকে উন্নত কিছুর সন্ধান ছিলো আরবে, শুধু আরবেই নয় বরং পারস্য, সিরিয়া এবং মিশরেও একই অবস্থা বিরাজমান ছিলো। ধর্মীয় বৈসাদৃশ্যের কারণে জরুথ্রুস্টবাদ, ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদের অনুসারীদের মনে একটি সন্তোষজনক ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বারবার অনুভূত হচ্ছিলো।”* [১০]

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই একটি উন্নত ধর্মের প্রত্যাশায় দিন কাটাচ্ছিলো, আর যখন সেই ধর্মের উপস্থিতি হলো তখন সবাইকে একত্রিত হয়ে সেই ধর্ম আর নবীর বিরোধিতা করতে হলো ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হলো! রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলো লেখকের দাবীকৃত এই কথিত মানবিক তাড়নারই প্রমাণ বহন করে কি? এতই যখন উন্নত ধর্মের প্রত্যাশা তবে কেন তারা তৎক্ষণাৎ সেই ধর্মকে মেনে নিলো না? কেন উল্লেখযোগ্য একটি অংশ সেই ধর্মের পক্ষ নিলো না আর বাকীদের প্রতিরোধ করলো না?[১১] যদি নতুন কিছু আনলেই সাফল্যের সম্ভাবনা চমকাচ্ছিলো তবে মুসাইলামা আর আসওয়াস আল আনসী যারা সেই সময়ে নবুওয়াতের দাবী করেছিলো তারা কেন সফল হলো না? লেখক এই অভিযোগ উঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতেন, তাই তার জবাব ও তিনি দিয়েছেন, তবে তা আসলেই হাস্যকর! তিনি লিখেছেন,

> *“মাহমেতের আগমনের উত্তেজনা অন্যান্যদেরকেও এই পথে আসতে প্ররোচিত করে। তবে মাহমেতের দূরদর্শিতা, তার ন্যায়বিচারের ধারণা, আমরা একে সত্য বলতে পারি; যা অন্যান্যদেরকে একেবারেই বিলীন করে দিয়েছিলো।”* [১২]

এককথায় তাঁর যোগ্যতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, ব্যক্তিগত উচ্চমানের চরিত্র, মহানুভবতা সততা সকল গুন স্বীকার করা গেলেও তিনি যে তাঁর নবুওয়াতের দাবীতে সত্য ছিলেন এই বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলা যাবে না, পাঠককে এইদিকে নজর ফেরাতেও দেওয়া যাবে না!

থমাস কার্লাইল ঐতিহাসিক না হলেও একজন পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮৪১ সালে তার On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in

Scanned by CamScanner

History বইটি প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে এই আলোচনায় তিনি স্থান দিয়েছেন। কবিদের থেকে শেক্সপিয়ার ও দান্তেকে, নেতাদের থেকে ক্রোমওয়েল ও নেপোলিয়ানের জীবনী উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কেও একটি অধ্যায় আছে। সেখানে তাঁকে একজন হিরো হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এর পাশাপাশি ইসলাম নিয়েও যৎসামান্য আলোচনা রয়েছে সেখানে। কোনো কোনো খ্রিস্টান পন্ডিত রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে এমন মন্তব্য করেছে যে খোদ ইউরোপেই তাদের জায়গা নেই; তাই অন্তত মুসলিমদের মাঝে তাদের কোনো প্রভাব পড়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

আবার প্রাচ্যবিদরা এদিক থেকে দুদলে বিভক্ত। একদল-সরাসরিই রাসুলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতারক বলে সকল অভিযোগ ছুঁড়ে দিয়ে থাকে; আরেকদল সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বস্তুনিষ্ঠতার মূর্তপ্রতীক হয়ে রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের 'আলোকিত অধ্যায়' তুলে ধরে। কার্লাইল এই দ্বিতীয় দলেই পড়েন। এই লোকের বৈশিষ্ট্য হলোঃ লোকেরা এই বিখ্যাত লোককে ভালো-খারাপ বলেছে, এখন সময় তার সেই ক্ষত সারিয়ে তোলার; প্রাচ্যের এই আরবীয় সংস্কারক কোনো অভিযোগের যোগ্যই নন। তিনি মোটেই চোর, প্রতারক ও লম্পট নন, তিনি তো যুগের একজন সংস্কারক ছিলেন, তিনি আরবের ভাগ্যই বদলে দিয়েছেন। তিনি তো সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, তাই আমাদেরও উচিত তাঁকে শ্রদ্ধা করা।

এভাবেই মুসলিমরা তার লেখার ফাঁদে পড়ে যায়। ভালো ভালো কথা দিয়ে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, তারপর নিজের চিন্তার নিগড়ে পাঠকদের বন্দী করে ফেলে। বইটা পড়ার পরে একজনের ধারণা হবে তিনি না একজন নবী, না তাঁর নবুওয়্যাত বিশ্বজনীন; বরং তিনি একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান সংস্কারক, ব্যস! এই প্রবন্ধের লেখক [১৩] তাঁর কলেজ জীবনে নিজেই এই অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন। এই অবস্থার কারণ এই নয় যে সে একজন ইসলামের সমালোচক বরং মিছরিমুখো শত্রুর ভান ধরা লেখনীর ধরণই এই মারাত্মক মিথ্যা বিশ্বাসের কারণ। একজন রাষ্ট্রনেতার সাথে একজন নিম কর্মচারী বা পিয়নের তুলনা দেওয়ার মতই এই ধরণের আচরণ। একজন রাজাকে এভাবে তুলনা করাটা কি সম্মান না অসম্মান? কার্লাইল তার লেখার শেষের দিকে লিখেছেন,

> *"সৃষ্টির শুরু থেকে অনালোচিত আরব যেন এই নতুন নবীর আবির্ভাবে পুর্নজন্ম নিলো, সেই নবী এমন এক বাণী নিয়ে আসলো যা তারা বিশ্বাস করতে পারে। এর মাধ্যমে তারা অন্ধকার থেকে আলোতে চলে আসলো। এক শতাব্দীর মধ্যেই তারা*

Scanned by CamScanner

সারা বিশ্বে আলোচিত হতে লাগলো, তাদের এক হাতে চলে আসলো গ্রানাডা আরেক হাতে দিল্লী!"[১৪]

আরবদের মধ্যেও এক ধরণের বস্তুবাদ ছেয়ে ছিলো। তারা বাহ্যিক ও বস্তুবাদী অলৌকিকতা দেখতে চাইত। পশ্চিমেও এই ধরণের মানসিকতা বিদ্যমান। **তাদের কথিত পন্ডিতরাও 'এক অশিক্ষিত সমগ্র আরবকে এক করলো' 'বিশ্ব জয় করলো' এইসব বস্তুবাদিতার পিছু ছাড়তে পারে না।** সে তো আসলে একজন রাষ্ট্রনেতা আর বুদ্ধিজীবী, আর কি? কার্লাইলের রচনার সারবস্তু হলো নবী আরবে এক বিপ্লব নিয়ে এসেছেন, ব্যস! একজন সিধাসাধা মুসলিম কার্লাইলের কথিত খ্যাতির বশে এই রচনা পাঠ করে, তখন সেই পাঠক কার্লাইলের বস্তুনিষ্ঠতার প্রশংসা না করে পারেই না। নবীর মহানুভবতা, বিপ্লব নিয়ে আসা সংস্কারকের ছাঁচে গলে যেতে বাধ্য হয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনে হয় 'ইসলাম মুহাম্মাদের ধর্ম'। মুহাম্মাদের মস্তিষ্কপ্রসুত হওয়ায় এর সাথে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্কই নেই। দেখুন সে কি লিখেছে,

"প্রতিটি মহান ব্যক্তিত্ব বিশেষত তাঁর মত ব্যক্তিত্বের জন্য তো অবশ্যই, এটা আমি জোরালো ভাবে বলতে চাই যে এটা তাঁর মধ্যে সুপ্ত ও ঘুমন্ত ছিলো, কি সেটা? সেটাকে আমি একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব বলবো। গভীর ও অনাবিল নিষ্ঠা, এই গুণটি ছাড়া মিরাবিউ, নেপোলিয়ান, বার্নস, ক্রোমওয়েল কেউই কিছু করতে পারে নি। এই গুনটি একজন মহান ব্যক্তিত্বের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য।"[১৫]

দেখেছেন তো! তাঁর সততায় কিন্তু তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি তো তাঁর নবুওয়াতে সৎ ছিলেন না, বরং এটা নেপোলিয়ান ও ক্রোমওয়েলের মতই এক গভীর ও আবিল নিষ্ঠার ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়! নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি কাজই প্রতারণা ও শঠতামুক্ত ছিলো, তিনি নিষ্ঠার সাথেই ঠিক তাই করেছেন যা তিনি নিজে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করতেন এবং যা করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর অন্তরের কথাই শুনেছেন,

"আমরা মাহমেতকে একজন দরিদ্র, বামুন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার চেষ্টাকারী, উন্মাদ বা বাগাড়ম্বরকারী বলে আর মানতে পারছি না। যেই নিষ্ঠুর বার্তা তিনি দিয়েছেন তা তিনি তাঁর অন্তরের গভীর থেকেই দিয়েছেন। অচেনা গভীরতা থেকে ভেসে আসা এক সন্দেহবাদী কণ্ঠস্বর...... এতে কোনো দুর্বলতা, অসততা বা ভ্রান্তি তাঁকে স্পর্শ করেনি, এগুলো তাঁর ব্যাপারে প্রমাণিত কিছু নয়। তাঁর ব্যাপারে এই ভুল ধারণাগুলো মুছে ফেলুন।"[১৬]

কার্লাইলের ইসলামের প্রতি ভালোবাসা পরিষ্কার হলো তো আপনাদের কাছে? কাহিনি আভি বি বাকী হ্যায়। যেই আবর্জনা তার লেখায় আছে তার আরো নমুনা

Scanned by CamScanner

আছে। এগুলো অবশ্য সে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে লেখেনি। সে হয়ত ভাবেই নি এই লেখা মুসলিমরা পড়বে। **লেখার পিছনে তার উদ্দেশ্য থেকে বেশি জরুরী তার লেখার প্রভাব। তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, যদি এই লেখার উদ্দেশ্য সত্যই রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকে ছোঁড়া অভিযোগগুলো খন্ডন করাই হয় তবে তার লেখা অবশ্যই রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহত্ব হৃদয় থেকে দূর করে দিতে পারে।** পাঠকরা তাকে বিশ্বাস করে সামনে আগাতে থাকে। বর্তমান যুবক শ্রেণী ও দ্বীনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এইসকল লেখকদের লেখা পড়ে। এভাবেই ইরতিদাদের পথে তাদের যাত্রা শুরু হয়। ইসলাম সম্পর্কে এই দরদী কথার পরে সে কি লিখেছে তাও একটু দেখে নিন!

> *"এককথায়-ভয়ানক, দিকহারা, বিরক্তিকর পুনঃরুক্তিতে ভরপুর, অপরিণত, জটিল, খাপছাড়া, বোকামিপূর্ণ; মনে হয় কর্তব্যপরায়ণতা ছাড়া ইউরোপীয়ানদের কুরআন থেকে শেখার কিছুই নেই।"*[১৭]

এটাই হচ্ছে তথাকথিত ইউরোপীয়ানদের কুরআন সম্পর্কে মতামত! এটা অবশ্য তারা কুরআন পড়ে পায় নি, পেয়েছে কোনো পাদ্রীর করা ইংলিশ ট্রান্সলেশান থেকে। এটা অবশ্য আসল ইংলিশ অনুবাদও নয় বরং তা ল্যাটিনের আদলে করা ইংলিশ অনুবাদ বলা চলে। অবশ্য এটা ও বলা যাচ্ছে না ল্যাটিন ও মূল অনুবাদ নাকি অন্য কোনো অনুবাদ কর্মের ছায়া? এটাই তথাকথিত নিরপেক্ষতা ও প্রজ্ঞা এইসব লেখকদের। ইসলাম বিদ্বেষী দ্বিতীয় কোনো মাধ্যমে পাওয়া এইসব মতামত তারা বড় নাছোড়বান্দার মত প্রচার করে থাকে। কার্লাইলের কোনো কথায়ই এরপরে অন্তত ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোন থেকে ভরসাযোগ্য নয়। কিন্তু বর্তমান পরাজিত মানসিকতার মুসলিমরা তাকে বড় চিন্তাবিদ ও একজন বিদগ্ধ পন্ডিত মনে করে, যারা ভাবে তিনি যেহেতু লিখেছেন তা অবশ্যই সত্য, এটাই এই পশ্চিমা সভ্যতা ও শিক্ষাব্যবস্থার ফিতনা। আরো শুনুন,

> *"একটি উজ্জ্বল আলো বন্য আরবকে প্রোজ্জলিত করতে আসলো। সন্দেহপূর্ণ, প্রভাময় আলোকমন্ডিত বিভা আকাশ ও পৃথিবীর জীবনস্বরূপ সেই অন্ধকারে আগমণ করলো। সে এর নাম দিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বার্তা আর জিব্রাইল। এছাড়া আর কি নামে তাকে ডাকা যায়?।"*[১৮]

অর্থাৎ, একজন সংস্কারক তার অন্তর থেকে এক বোধপ্রাপ্ত হলেন, যাকে তিনি নিজেই নাম দিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বার্তা এবং জিব্রাইল। তাকে এখান থেকে কোনো প্রকারেই প্রতারক ও ধূর্ত বলা যাবে না, তবে নবী ও তো বলা যাচ্ছে না! কুরআন সম্পর্কে কার্লাইলের জঘন্য ও শয়তানী মতামত এখানে উল্লেখ করা

Scanned by CamScanner

জরুরী মনে করা হচ্ছে না। যথেষ্ট প্রমাণ ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। আমাদের যুবকরা তাদের 'গবেষণা' দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়ে থাকে। এসব লেখকদের ব্যাপারে ভুল হওয়ার থোড়াসা সন্দেহ ও তাদের মনে কখনো আসে না। তারা অনেকটা এভাবে ভেবে বসেন, **'যখন এরকম নিরপেক্ষ-বস্তুনিষ্ঠ ও ইসলামের প্রতি দরদ রাখা পণ্ডিত লেখক এরকম মন্তব্য করেছেনই তখন অবশ্যই এতে সত্যের ছোঁয়া থাকবে। আমরা সারাজীবন আমাদের বাবা-মা, পরিবারের নিকট থেকে যা শুনেছি তা রূপকথার গল্প। অবশ্যই কুরআনে কিছু সমস্যা আছে, তা না হলে এরকম জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই তা বলতেন না।'**

কার্লাইল আর গিবনরা রাজপালের[১৯] মত প্রকাশ্য ইসলাম বিরোধী থেকেও বেশি ভয়ানক। রাজপালের জঘন্য কারনামা দেখে হয়ত কোনো মুসলিম তাঁর গাইরাতের তাড়নায় ঈমানকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কার্লা ইলের মত এরকম ধূর্তরা যখন নিরপেক্ষতার মুখোশে বন্ধু রূপে আসবে তখন কে এর প্রতিরোধ করতে আসবে? বরং সেই ব্যক্তি অজান্তেই এই ঈমানচোরদের খপ্পড়ে পড়ে ঈমান খুইয়ে বসবে। কেউ শমসের নিয়ে এগিয়ে এলে তাঁর বিপক্ষে তরবারী ধরা যায়, কিন্তু যে জানের দোস্ত সেজে সাক্ষাৎ বিষ নিয়ে আসে তাকে রুখবে কার সাধ্য?

Scanned by CamScanner

তথ্যসূত্র

[১] উক্ত লেখাটি মূলত মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদীর 'সিরাতে নববী অওর উলামায়ে ফারাঙ্গ' থেকে গৃহীত, যা "সুলতান-ই-মা-মুহাম্মাদ" এ এসেছে। (লাহোর, দারুল তাযকির, ২০০৬) ৮৫-১০১

[২] Finlay, George, Greece under the Romans, (London: William Blackwood and Sons, 397 (1857

[৩] তারা হলেন ওয়ারাকা বিন নওফেল আর উছমান ইবনুল হুওয়াইরিছ

[৪] সে হলো উবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশ যে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে ইসলামের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহন করলেও পরবর্তীতে দ্বীনত্যাগ করে খ্রিস্টান হিসেবে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) মারা যায়।

[৫] যাইদ ইবন আমর ইবন নুফাইল যিনি ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার পূর্বেই মারা যান।

[৬] "During the youth of Mohammad, the aspect of the Peninsula was strongly conservative; perhaps never at any previous time was reform more hopeless. Causes are sometimes conjured up to account for results produced by an agent apparently inadequate to effect [sic] them. Mohammad arose, and forthwith the Arabs were aroused to a new and a spiritual faith; hence the conclusion that Arabia was fermenting for the change, and prepared to adopt it. To us, calmly reviewing the past, pre-Islamite history belies the assumption" Muir, William, The Life of Mohammad, (Edinburgh: John Grant, 1923) xcvii

[৭] Finlay, George, Greece under the Romans, 423

[৮] ibid., 436

[১০] ibid., 436 to 437

[১১] দরিয়াবাদীর খন্ডিত এই যুক্তিই আবার আওড়েছে ক্যারেন আর্মস্ট্রং তার Islam: A Short History বইতে। সে লিখেছেন, "তখন আরব উপদ্বীপে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অস্থিরতা কাজ করছিলো।" (পৃ-৩)

[১২] Finlay, George, Greece under the Romans, 438

[১৩] দেখুন দরিয়াবাদীর আত্মজীবনী 'আপবীতি'

[১৪] Carlyle, Thomas, On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History, 75

[১৫] ibid., 44

[১৬] ibid., 45

[১৭] ibid., 63

[১৮] ibid., 56

[১৯] মহাশয় রাজপাল ১৯২৭ সালে রাসুলুল্লাহর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে একটি কটুক্তিমূলক বই প্রকাশ করে।

Scanned by CamScanner

৮ম অধ্যায়

আলেয়ার আলো

লস্ট মডেস্টি

যা থাকছে-

- পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী ও যৌন নিপীড়ন
- ইসলাম ও নারীর সুরক্ষা

Scanned by CamScanner

পাশের বাসার নাফিস ভাই। এক ক্লাস উপরে পড়তেন। একজন পরিপূর্ণ অলরাউন্ডার, চ্যাম্পিয়ন। যেমন পড়াশোনা তেমনি বিতর্ক,আবৃত্তি, গল্প লিখা, বাবা-মায়ের সাথে সুন্দর ব্যবহার। আমাদের পরিবারের কাছে তিনি সেলিব্রেটি টাইপের কিছু ছিলেন। দূর আকাশের তারা। (আমার কাছে অবশ্য ভিলেন।) উঠতে বসতে বাবা মা তাকে অনুসরণ করতে বলেন- নাফিসের মত হ, সে এতক্ষণ পড়াশোনা করে, সে দুপুরে ঘুমায়, তোর মতো টো টো করে রোদে ঘুরে বেড়ায় না। মাথার চুল এতো বড় কেন তোর, শার্টের উপরের বোতাম দুইটা খোলা কেন, নাফিসের চুল দেখিস কতো সুন্দর করে কাটা। মা গিয়ে নাফিস ভাইয়ার কাছ থেকে নোট নিয়ে আসতেন, সাজেশন নিয়ে আসতেন, পারলে নাফিস ভাইয়ার পা ধোয়া পানি নিয়ে এসে আমাকে খাওয়ান...

মানুষের ফিতরাহ এমন সে সফলদের অনুসরণ করতে চায়। সফলরা যে পথে চলে সফলতা পেয়েছে সে পথ তাদের টানে দুর্নিবার আকর্ষণে। পাশ্চাত্যের বস্তুগত উন্নতি দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া বিশ্ব অন্ধভাবে অনুকরণ, অনুসরণ করেছে পাশ্চাত্যকে। আগপিছ কিছু না ভেবেই ডিরেক্ট কপিপেস্ট করেছে পাশ্চাত্যের জীবনবোধ, দর্শন, রাষ্ট্র, সমাজ পরিচালনা পদ্ধতি। পাশ্চাত্য যাই বলেছে যেটা করতে বলেছে আসমানী ওহীর মতো মাথা পেতে নিয়েছে বাকী বিশ্ব। যারা মেনে নিতে চায়নি, তাদেরকে জোর করে মানতে বাধ্য করা হয়েছে। কখনো পারমানবিক বোমা, কখনো ড্রোন হামলা, কখনো কুটিল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পাশ্চাত্য তাদের মতবাদ চাপিয়ে দিয়েছে।

নারীদের প্রতি সহিংসতা বিশেষ করে যৌন সহিংসতা, ধর্ষণ কীভাবে বন্ধ করা যায়? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য বললো- পুরুষের আধিপত্যশীল মনোভাব দূর করতে হবে, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে, পুরুষের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে, নারী পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ মেলামেশার ব্যবস্থা করতে হবে বেশি বেশি, পতিতালয় খুলতে হবে বেশি বেশি।

Scanned by CamScanner

সফলদের অন্ধভাবে অনুসরণ করার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে বাকী বিশ্ব মেনে নিয়েছে এগুলো। আমল করেছে পাশ্চাত্যের ফর্মুলায়। পশ্চিম নারীমুক্তির যে তরীকা বাতলে দিয়েছিল সেটা কোনো দেশেই কোনো স্থানেই নারীদের মুক্তি দিতে পারেনি। বরং যে দেশ যতবেশি তাদের তরীকায় আমল করেছে সে দেশে নারীরা ততবেশি নির্যাতিত হয়েছে, ধর্ষণের শিকার হয়েছে। প্রতি ৯৮ সেকেন্ডে একজন আমেরিকানকে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়, [http://tinyurl.com/k8ehojc], প্রতি ৬ জন নারীর মধ্যে ১ জন এবং প্রতি ৩৩ জন পুরুষের মধ্যে একজন তাদের লাইফটাইমে একবার হলেও ধর্ষণের শিকার হয়। [http://tinyurl.com/nm3gp5o]

মহান সভ্যতার অনুগামী আরেকদেশ অস্ট্রেলিয়াতে প্রতি ছয় জন মহিলার মধ্যে একজন যৌন নিপীড়নের শিকার হন তাদের সংগী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের হাতে। সংগীদের দ্বারা যৌন নিপীড়ন বিবেচনায় আনলে যৌন নিপীড়নের হার নেমে আসে প্রতি পাঁচ জনে একজন। অস্ট্রেলিয়াতে নারীদের যৌন নিপীড়নের হার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এভারেজ যৌন নিপীড়নের হারের দুইগুণেরও বেশী।

http://tinyurl.com/ya7jlwmx,

http://tinyurl.com/yafduj5j,

http://tinyurl.com/y7kstly5

ইংল্যান্ড এবং ওয়ালেসের প্রতি ১৪ জন প্রাপ্তবয়স্কদের একজন বাল্যকালে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। গ্রেট ব্রিটেন শিশু নিপীড়কদের স্বর্গরাজ্য।

https://goo.gl/9cckzW, https://goo.gl/ZFfa1E

আমেরিকাতে প্রতি ৪ জন নারীর একজন এবং প্রতি ৬ জন পুরুষের একজন ১৮ বছরে পা দেবার পূর্বে একবার হলেও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। তার মানে এখন আমেরিকাতে ৪২ মিলিয়নের বেশী প্রাপ্তবয়স্ক আছেন যারা শৈশবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

https://goo.gl/wmko27

https://goo.gl/9FMiuh

বিশ্বের যে দেশগুলোতে শিশুরা সর্বাধিক যৌন নিপীড়নের শিকার হয় সেই দেশগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকাতেও রয়েছে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড এর নাম।

https://goo.gl/b8MgJd

আমেরিকাতে প্রতি পাঁচজন নারীশিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতনের শিকার

Scanned by CamScanner

হন।

[https://goo.gl/JKAccc]

অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোতেও প্রতি পাঁচ জনে একজন যৌন নিপীড়নের শিকার হন। প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

http://tinyurl.com/ybgly3z9

http://tinyurl.com/yccfsdzd

ব্রিটেনে কর্মক্ষেত্রে অর্ধেক নারীই যৌন হয়রানির শিকার হন।

[http://www.bbc.com/bengali/news41746980-]

শুধু ব্রিটেন নয়,জার্মানি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, জাপান, ভারত, হংকং কোন দেশের কর্মক্ষেত্রে নারীরা নিরাপদ?

প্যারিসের পাব্লিক ট্রান্সপোর্টে শতকরা ১০০ জন নারীই যৌন নির্যাতনের শিকার হন।

https://goo.gl/jx1oB4 https://goo.gl/rmozJW https://goo.gl/fxyhfH

ইংল্যান্ড,আমেরিকা, কানাডা,ইন্ডিয়াতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়না।

পড়ুন,

আমেরিকার রাস্তাঘাটে যৌন হয়রানিঃ

https://goo.gl/cMXq4k https://goo.gl/zVMKkV

ইংল্যান্ডের রাস্তাঘাটে যৌন হয়রানিঃ

https://goo.gl/JWwb52 https://goo.gl/njUwNg

কানাডার রাস্তাঘাটে যৌন হয়রানিঃ

https://goo.gl/HphYfF https://goo.gl/b5EvTC

ইন্ডিয়ার রাস্তাঘাটে যৌন হয়রানিঃ

https://goo.gl/JnBhVj https://goo.gl/nRCQ5J https://goo.gl/pCWaLZ

পাশ্চাত্যের বাতলে দেওয়া সিস্টেম গ্রীসের মেয়েদের বাধ্য করেছে সামান্য একটা স্যান্ডউইচের বিনিময়ে শরীর বিক্রি করতে।

https://goo.gl/24a1hd https://goo.gl/tiuf5S

Scanned by CamScanner

পাশ্চাত্যের নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা আর নারীর ক্ষমতায়নের মুখোশের আড়ালের চেহারা উন্মোচন করে ছেড়েছে #MeToo মুভমেন্ট। হলিউড বলিউডের প্রভাবশালী অভিনেত্রী, গায়িকা, সংসদসদস্য, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা...কেউই রক্ষা পায়নি যৌন নিপীড়নের হাত থেকে। অথচ পাশ্চাত্য বলেছিলো এসব পেশা নারীর ক্ষমতায়নের উৎকৃষ্ট নমুনা। নারীরা এসব পেশার মাধ্যমে নিজেদের এম্পাওয়ার্ড (Empowered) করবে। পাশ্চাত্য শুধু তত্ত্ব কপচিয়ে গিয়েছে কিন্তু সেই তত্ত্ব যে সফল হবে, নারীদের মুক্ত করবে সেই প্রমাণ রাখতে তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই যে বছরের পর বছর জুড়ে তাদের তরীকায় বিশ্ব আমল করে যাচ্ছে, এতে কি নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন কমেছে? আমরা কেন তাহলে পাশ্চাত্যের জীবন দর্শন নিয়ে প্রশ্ন তুলবোনা? কেন তাদের এই মাতব্বরি মেনে নিব? কোন দুঃখে আমরা এরকম ফেল্টুস এক সভ্যতার অনুসরণ করব?

কাফিরদের আকাশ ছোঁয়া দালান কোঠা, স্বর্ণ রৌপ্য, সুন্দরী নারী, সুসজ্জিত,চোখ ধাঁধানো শহর দেখে যেন মুসলিমরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে, যেন তাদের অনুসরণ করা না শুরু করে সেজন্য আল্লাহ্ (সুবঃ) সতর্ক করে বলছেন-

> *"নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন তোমাদেরকে যেন ধোঁকা না দেয়। এটা (দুনিয়ার জীবনের প্রাচুর্য) হলো সামান্য ফায়দা, এরপর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর থাকার জায়গা হিসেবে সেটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট"। (সুরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৯৬-১৯৭)*

আল্লাহ্ (সুবঃ) কেন এভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোকে? যেন কাফিরদের সুরম্য অট্টালিকা, ঝকঝকে রাস্তাঘাট, আলোয় ভেসে যাওয়া মায়াবী রাত, সাদা চামড়া, টেকনোলজি, শক্তিশালী আর্মি দেখে মুসলিমদের মনে হীনমন্যতার জন্ম না হয়। মুসলিমদের মনে যেন ভুলেও এ চিন্তার জন্ম না হয় আমরা ইসলাম অনুসরণ করছি দেখেই আজ আমাদের এই করুণ অবস্থা। ওদের মতো হতে পারলেই ওদের মত ও পথ অনুসরণ করলেই আমরা ওদের মতো সফল হয়ে যাব। আমাদেরও ওদের মতো সুউচ্চ প্রাসাদ হবে, বড় বড় ব্রিজ হবে, ফ্লাইওভার হবে, আমাদের বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, আমরা সাদা চামড়ার মতো খই ফুটানো ইংরেজিতে কথা বলবো, বার্গার পিৎজা খাবো, সুপার শপে ক্রেন ঠেলতে ঠেলতে আলু পটল কিনব। উফ! কী কুল কী অসাম এক লাইফ!

সফলদের অনুসরণ করার সেই চিরায়ত প্রবৃত্তি যেন আমাদের ফিতনায় না ফেলে দেয়। বাইরে থেকে দেখে যতোটাই উন্নত, মহান, সুখী, সমৃদ্ধ মনে হোকনা কেন যে সভ্যতা কুফরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা কখনো সত্যিকার অর্থে সফল হতে

Scanned by CamScanner

পারেনা। চাকচিক্য আর প্রাচুর্যের চোখ ধাঁধানি সভ্যতার পচনকে আড়াল করতে পারেনা। পারেনা মানুষকে শান্তি দিতে।

আমরা এখানে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে শুধু যৌন নির্যাতনের ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছি। পাশ্চাত্যের সামাজিক,পারিবারিক জীবনের হতাশা বিচ্ছিন্নতা, তরুণ তরুণীদের আত্মহত্যার হার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ছিনতাই, লুটপাট, ডাকাতি, মানব পাচার, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলে রাত কাবার হয়ে যাবে তবু আলোচনা শেষ হবেনা।

বাংলাদেশ কি এখন তার নিকট ইতিহাসের মধ্যে সবচাইতে বেশি সেকুল্যার না? সবচাইতে বেশি পাশ্চাত্যের অনুসরণ করছেনা? চেতনা, ফ্রি মিক্সিং, ফ্রি সেক্স, পতিতা গমনের সুবিধা, তথাকথিত লিটনের ফ্ল্যাট নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষা, পুরুষদের মানসিকতা পরিবর্তনের চেষ্টা, বস্তুগত উন্নয়ন, ফ্লাইওভার,রাস্তাঘাট স্মরণকালের ইতিহাসের মধ্যে সবচাইতে বেশি হচ্ছে না? কিন্তু তারপরেও কেন এতো ধর্ষণ? দুই আড়াই বছরের শিশুও ধর্ষণ হচ্ছে? ধর্ষণ হচ্ছে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধারাও!

তাহলে সমাধান কী ? ধর্ষণ কীভাবে কমবে? কোন তরীকায় আমল করতে হবে?

আরবের সেই সময়টাকে বলা হতো আইয়ামে জাহেলিয়্যাহ- অন্ধকারের যুগ। নারীরা ছিলো কেবলই ভোগের পাত্র, কন্যা শিশুদের জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। নারীর মান সম্মান বলে কিছু ছিলোনা। একটা কুকুরের যে অধিকার ছিল, নারীর সে অধিকারটুকুও ছিলনা বর্বর,মদখোর রক্তপিপাসু, যুদ্ধবাজ আরবদের কাছে।

কয়েকবছরের ব্যবধানে এই আরব এমন পালটে গেল যে নারীরা একাকী দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সফর করতে আসত, কিন্তু কেউ একবার চোখ তুলে তাকাতেও সাহস করতোনা। ধর্ষণ করা, যৌন নিপীড়ন করাতো দূরে থাক,চোখ তুলেও কেউ তাকাতোনা। কিসের পরশে রাতারাতি বদলে গিয়েছিলো বর্বর নারীলোভী আরবেরা? ইতিহাসকে প্রশ্ন করুন। ইতিহাস আপনাকে জবাব দিবে- আরবদের সেই পরশ পাথর ছিলো বিশুদ্ধ তাওহীদ, আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ, খিলাফাহ, মিল্লাতে ইবরাহীম, আখিরাতের প্রবল ভয়, সাথে পরিপূর্ণ সমাজে আল্লাহভীরুতা প্রতিষ্ঠা, পর্দা, পবিত্র ও নৈতিক পরিবার ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়বিচার তথা কুরআনি আইন।

এগুলো অতীতের রূপকথা নয়। একদম বাস্তব। পাশ্চাত্যের মতো নারীর নিরাপত্তার জন্য কেবল এই থিওরি ঐ থিওরি কপচানো নয়, বরং বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছিল যে আসলেই শরীয়া নারীকে নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে রাখে। কোনো লম্পট চোখ তুলে তাকানোর সাহস পর্যন্ত দেখাতে পারেনা।

Scanned by CamScanner

আদি ইবনে হাতিম তাঈ ছিলেন আরবের তাঈ অঞ্চলের বাদশাহ। বাধ্য হয়ে আসতে হলো মদীনায়, এলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে। মুসলিমদের ফকিরী হালত দেখে ইসলাম গ্রহণ করতে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ঘরের একমাত্র খেজুরের গদিতে বসালেন আদি ইবনে হাতিম তাঈকে। তারপর বললেন এমন কিছু কথা যা আমাদের সময়ের জন্য খুবই খুবই প্রাসঙ্গিক।

'হে আদি! নিশ্চয় তুমি মুসলিম জাতির অভাব ও দারিদ্র দেখে এই দ্বীন গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছো। যদি সেটাই হয়ে থাকে, তাহলে তুমি শুনে নাও, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, এমন একটি সময় খুব কাছে এসে গেছে যখন তাদের মাঝে ধন-ঐশ্বর্যের এত প্রাচুর্য হবে যে যাকাত ও সাদাকাহ নেওয়ার কোনো মানুষ থাকবেনা। হে আদি! মনে হচ্ছে তুমি মুসলিম জাতির সংখ্যা স্বল্পতা এবং বিরোধী ও শত্রুদের অগণিত সংখ্যা দেখে এই দ্বীন ইসলাম গ্রহণে দ্বিধাবোধ করছ। যদি তাই হয় তাহলে মনে রেখো, আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, খুব শীঘ্রই তুমি শুনতে পাবে সুদূর কাদেসিয়া থেকে উটের পিঠে চড়ে একাকিনী মহিলা আল্লাহ্র ঘর যিয়ারতে আসবে। একমাত্র আল্লাহ্র ভয় ছাড়া তাঁর মনে আর কোনো ভীতি থাকবেনা।

সম্ভবত তোমার ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা এটাও যে তুমি রাষ্ট্র ক্ষমতা ও বাদশাহী দেখতে পাচ্ছ অমুসলিমদের হাতে। আল্লাহর কসম! খুব শিগগির তুমি শুনবে এবং দেখবে যে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দেখবে ইরাকের বাবেল নগরীর সাদা মহলগুলো (রাজপ্রাসাদ) মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। পারস্যসম্রাট কিসরা ইবনে হুরমুজানের ধনভান্ডার তাদেরই কবজায় এসে পড়েছে'।

আদি ইবনে হাতিম তাঈ বলেন, 'আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম; অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইলাম, কিসরা ইবনে হুরমুজানের সব ধন-ভান্ডার'?

তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজানের সব ধন-ভান্ডার'।

আদি বলেন, 'তখনই আমি কালিমা-ই শাহাদাত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিলাম'।

আদি ইবনে হাতিম দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, ' প্রিয় নবীর দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী তো দেখেই ফেলেছি। তৃতীয়টি দেখা বাদ রয়েছে। আল্লাহর কসম করে বলছি সেটাও ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি নিজের চোখে দেখেছি, সুদূর কাদেসিয়া থেকে উটে চড়ে একাকিনী মহিলা নির্ভয়ে বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে আসে...

আমি নিজে সেই সেনাদলের অগ্রভাগে থেকে অভিযান শরিক হয়েছিলাম, যারা কিসরার ধনভান্ডার কবজা করেছিল। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তৃতীয়

Scanned by CamScanner

ভবিশ্যত বাণীটিও ঘটবেই'।

আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর প্রিয় নবীর ঘোষণার বাস্তবায়ন ঘটেছিল, তৃতীয় ঘোষণার বাস্তব রূপায়ন দেখা গেল পঞ্চম খলীফায় রাশেদা উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে। তাঁর আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যে ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য দেখা দিল যে, তিনি সরকারি লোক মারফত পথে পথে ঘোষণা দিলেন , 'যাকাত নেবার মতো কে আছো'? কিন্তু একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যায়নি। (সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন প্রথম খন্ড, রাহনুমা পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা ২২১-২২৩)

মুসলমান কেন পাশ্চাত্যের আলেয়ার পিছনে ঘুরছিস? দুনিয়ার সুখ সমৃদ্ধি, শান্তি, নিরাপত্তা, ক্ষমতা অর্জনের ম্যানুয়াল তোর চোখের সামনেই। অবহেলায় অযত্নে পড়ে আছে টেবিলের কোণায়। ধুলো মুছে একবার খুলে দেখ। শক্ত করে আঁকড়ে ধর মিল্লাতে ইবরাহীমকে। এই খামখেয়ালীপনা আর উদ্দেশ্যহীনতার অন্ধকারের পর্দাটা সরিয়ে জাজ্বল্যমান সূর্যটাকে একটু দেখেই নে!

Scanned by CamScanner

৯ম অধ্যায়

স্বর্গের দিন স্বর্গের রাত!

লস্ট মডেস্টির ভলান্টিয়ার, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। লেখক কানাডার কিউবেকে অধ্যয়নরত।

যা থাকছে-

- পশ্চিমের সামাজিক অবস্থা
- পশ্চিমের নৈতিক অবক্ষয়

Scanned by CamScanner

ছোটবেলা থেকেই বিদেশী মুভি দেখা বা বই পড়ার কারণে বিদেশ (স্পেশালি নর্থ আমেরিকা, ইউরোপ) এবং বিদেশের জীবন নিয়ে একটা ফ্যাসিনেশন থাকে সবার। ওয়েল, সবার থাকে কি না বলতে পারি না, অন্তত আমার ছিলো। ওখানকার মানুষদের প্রতি মৃদু ঈর্ষাও হত যে তারা ছোটবেলা থেকেই কি চমৎকার পরিবেশে, সুন্দর জায়গায় বড় হচ্ছে, থাকছে। মনে হত কোনো মতে ওরকম একটা দেশে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে। যতই সময় যাচ্ছে, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ততই কৃতজ্ঞ হচ্ছি যে উনি আমাকে চমৎকার একটি মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। দিয়েছেন পরিবারের প্রতি সম্পূর্ন নিবেদিত একজন মা এবং স্ত্রী-সন্তানদের সযত্নে আগলে রাখা একজন বাবা।

কানাডায় আমার প্রবাসের প্রায় এক বছর পার হতে চললো। এই এক বছরে এখানকার মানুষদের প্রতি আমার সেই ফ্যাসিনেশনটি করুণায় পরিণত হয়েছে। পড়াশোনা আর অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজরের মানসিক যাঁতাকল নিয়ে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টদের কষ্টের কথা দেশের অনেকেই মোটামুটি শুনেন/জানেন বলে সেটা নিয়ে এখানে কথা বলবো না। তার চেয়ে বরং চেষ্টা করবো একটু ব্যাখ্যা করার কেন এখানের মানুষগুলো আমার চোখে ফ্যাসিনেশন থেকে করুণার পাত্রে পরিণত হলো। তবে প্রথমেই বলে নেই যে এদের একদম সবকিছুই খারাপ না, কিছু কিছু জিনিস আমার ভালো লাগে। ওগুলোও বলবো।

এখানে অনেক ধর্মের এবং অনেক ধরণের মানুষ আছে। আস্তিক, নাস্তিক, ট্রান্সজেন্ডার, হোমোসেক্সুয়াল সবই আছে প্রচুর পরিমাণে। ইহুদি অধ্যুষিত এলাকায় ইহুদি উপাসনালয়, স্কুল/কলেজ অনেক। আবার নগরের ভিতর জায়গায় জায়গায় খ্রিস্টানদের চার্চ আছে ভালই। "জেহোভার সাক্ষী" (Jehovah's Witness) হল খ্রিস্টানদের ধর্মীয় দাওয়াত দেওয়ার একটি গ্রুপ। এরা সপ্তাহে একবার-দুইবার সবাই একসাথে বসে বিভিন্ন সোশাল অ্যাকটিভিটি করে (যেমন সবাই মিলে নতুন কোনো

Scanned by CamScanner

ভাষা শেখা, বা শিক্ষামূলক ভিডিও দেখা) আর খ্রিস্ট ধর্মের গুণগান করে (গায়)। মাঝে মাঝে নতুন কাউকে পেলে দাওয়াত দেয়। আমাকেও দুই-তিনবার ভদ্রভাবে দাওয়াত দিয়েছিলো ওদের দুইজন। সাদা চামড়ার একজন মানুষ রাস্তায় হঠাৎ করে আমাকে দাঁড় করিয়ে মোটামুটি শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে, বেশ অবাকই হয়েছিলাম। ঐ কাহিনীগুলো আরেকদিনের জন্য তোলা থাক। মসজিদও আছে মোটামুটি ভালোই। বাংলাদেশ থেকে আসার পর যে জিনিসগুলো মিস করি, সেগুলোর একটা হল প্রতি ওয়াক্তে আযান শোনা। এখানের নিয়ম হলো মসজিদে আযান হলে আযানের শব্দ শুধু মসজিদের ভিতরেই থাকবে, বাইরে যাবে না। তাই সাধারণত ঘড়িতে সময় দেখেই নামাজ পড়া লাগে, আযান শুনে নয় [১]।

আপাতদৃষ্টিতে এরা ধর্মনিরপেক্ষ। সরকার বড় গলায় তা-ই প্রচার করে। কিন্তু হর্তা-কর্তাদের নীতি নির্ধারণী দেখে বোঝা যাবে এরা আসলে অ্যান্টি-মুসলিম ছাড়া কিছুই না। কিছুদিন আগেই নিয়ম করা হয়েছে যে বাসে/ট্রেনে উঠতে হলে মুখ ঢেকে রাখা যাবে না। নিকাব করা যাবেনা। সরকারী কোন অফিসে চাকরি করতে হলে এমন কোনো পোষাক পরা যাবে না যেটা দেখে তার ধর্ম বুঝা যায় (হিজাব, নিকাব, টুপি ইত্যাদি)। [২,৩,৪]

সাধারণ মানুষদের কাছে ধর্ম বেশ সেনসিটিভ বিষয়। প্রফেশনাল ওয়ার্কপ্লেসে কেউ সাধারণত কারো ধর্ম নিয়ে কোন কথা বলে না। কোনো মিটিং শেষে কোনো নারী হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত এগিয়ে দিলে ভদ্র ভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলি যে আমি মুসলিম।

যেহেতু এটা “উন্নত বিশ্ব”, তাই এখানে ট্রান্সজেন্ডার[1], হোমোসেক্সুয়াল এবং হাজারো সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের মানুষের সংখ্যা অগণিত। রাস্তা ঘাটে অহরহ এরকম কাপল ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। বছরে একবার ঘটা করে LGBT প্রাইডের র‍্যালি হয়। যদিও এখন শুধু LGBT তেই সীমাবদ্ধ নেই, কিছুদিন পর পরই একটা-দুইটা করে লেটার বা সিম্বল যোগ হতে থাকে, দেখা যাবে আমার এই লেখা লিখতে লিখতে আরো লেটার যোগ হয়ে গেছে, তাই শুধু LGBT তেই রেখে দিলাম। (কানাডা হলো বিশ্বের চতুর্থতম দেশ যারা সমলিঙ্গের বিয়েকে বৈধ্যতা দিয়েছে। আমেরিকারও অনেক আগে। সমকামী বিয়ের বৈধতা দানকারী প্রথম তিনটি দেশ হল যথাক্রমে

---

[1](Transgender বা Transexual এবং হিজড়া কিন্তু এক জিনিস নয়। হিজড়া মানে তো বুঝতেই পারছেন। Transgender বা Transexual হলো এমন একদল মানুষ যারা মনে করে তারা ভুল শরীরে আটকা পড়েছে। জন্মগতভাবে পুরুষ মনে করে যে, সে আসলে নারী কিন্তু পুরুষের শরীরে আটকা পরেছে। ঠিক একইভাবে জন্মগতভাবে নারী মনে করে যে সে আসলে পুরুষ, কিন্তু ভুলে নারীর শরীরে আটকা পড়েছে।-লস্টমডেস্টি)

Scanned by CamScanner

নেদারল্যান্ড,বেলজিয়াম এবং স্পেইন- লস্টমডেস্টি)। [৫,৬])

এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। কিভাবে একটা সমস্যা থেকে আরো সমস্যা তৈরী হয়, কিভাবে সমস্যা সমাধানের ভান করতে হয়, এগুলো একটু আলোচনা করা যাক। শীতকালে রাস্তা-ঘাটে চলাচল করে একটু শান্তি পাওয়া যায়। ঠান্ডা যত বেশি, তত ভালো। কেন? কারণ, পোশাক। গরমের সময় নারীকুলের পোশাকের অবস্থা এত বাজে থাকে যে রাস্তা-ঘাটে চলাচল করতে গেলে প্রায় পুরোটা সময়ই চোখ মাটির দিকে রাখা ছাড়া উপায় থাকে না। আচ্ছা পোশাকের কথা তো বললাম। এবার এর সাথে "একেবারেই সম্পর্কহীন" আরেকটি জিনিস বলি। যৌন হয়রানি। কেন জানি (!) এসব দেশে যৌন হয়রানি খুবই বেশি। এবং এরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য খুবই তৎপর (!)। সব অফিসেই বছরে অন্তত একবার যৌন হয়রানি রোধে সেমিনার হবে। আমি রিসার্চ ট্রেইনি হিসাবে একটি সংস্থায় যোগ দেওয়ার কয়েকদিন পর একটি বাধ্যতামূলক সেমিনারের ইনভাইটেশন পেলাম। বিশাল অডিটোরিয়ামে সব কর্মীদের নিয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধমূলক এক সেমিনার। মূলত, কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, নারী সহকর্মীর সাথে খাজুরে আলাপের সময় কোন কোন কথা বলা যাবে আর কোন কোন কথা বলা যাবে না, স্পর্শ করা যাবে কি যাবে না, এসবই সবাইকে বলা হল ঘণ্টাখানেক ধরে।

এদের একটা "যেমন খুশি তেমন সাজো" দিবস থাকে প্রতি বছর। আদর করে সেই দিবসকে হ্যালোউইন বলা হয়। হ্যালোউইনে নিজের স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটাতে অনেকেই সর্বনিম্ন পরিমাণের কাপড় পরে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে। এই হ্যালোউইনের কয়েকদিন আগে থেকেই দেখলাম ক্যাম্পাসে বেশ কিছু পোস্টার যে হ্যালোউইনে মানুষ যেন যৌন হয়রানি থেকে সাবধান থাকে।

এদের এই সব ঢং দেখে মনে হয় ব্যাপারটা এরকম- আমি জানি আগুনে হাত দিলে আমার হাত পুড়ে যাবে। আমি তাও আগুনে হাত দিব, কিন্তু চাইবো যে আমার হাত পুড়বে না, হাজার রকমের চেষ্টা করতে থাকবো হাত না পুড়ানোর, শুধু আগুন থেকে হাতটা টেনে বের করা ছাড়া।

কিছুদিন আগে একটা আর্টিকেল পড়লাম যে #metoo মুভমেন্টের কারণে এখন কর্মক্ষেত্রে পুরুষরা তাদের নারী সহকর্মীর সাথে একদম প্রয়োজন ছাড়া অযথা কোনো সময় কাটাচ্ছেন না, একসাথে একান্তে লাঞ্চ বা ডিনার করা তো দূরের কথা (যা কি না খুবই প্রচলিত ছিলো)। ঐ আর্টিকেলে নারী-পুরুষের এই দূরত্বকে নেতিবাচক জিনিস হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছিল, কিন্তু আমার বরং খুশিই লাগল।

Scanned by CamScanner

(কানাডাতে নারী এবং শিশুদের ভয়ঙ্কর যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয়। প্রতি ৩ জন কানাডিয়ান নারীদের মধ্যে ১ জন যৌন নিপীড়নের শিকার হন। প্রতি ৬ জন পুরুষের মধ্যে ১ জন জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও যৌন নিপীড়নের শিকার হন। ভয়ের ব্যাপার হলো শতকরা ৫ জন তাদের যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে মুখ খোলেন। #metoo মুভমেন্টের পর অবশ্য রিপোর্ট করার সংখ্যা বেড়েছে। ৬৭ শতাংশ কানাডিয়ান জানাচ্ছেন তারা কমপক্ষে এমন একজন নারীকে চেনেন যাকে দৈহিক বা যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। ধর্ষণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এলকোহল।[৭,৮,৯]

২০১৪ সালের একটি জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় ২৪ লক্ষ কানাডিয়ান শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা আরো বহুগুণে বেশি। আমরা আগেই বলেছি যে যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে খুবই কম সংখ্যক কানাডিয়ান মুখ খোলেন।[১০]

Canadian Medical Association Journal বলছে এই সংখ্যা আরো বেশি। প্রায় ৩৬ লক্ষ। মানে হলো প্রতি ১০ জনে ১ জন ১৬ বছর বয়স হবার আগেই যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।[১১,১২]

কানাডার কর্মক্ষেত্র-অফিস আদালত নারীদের জন্য স্রেফ জাহান্নাম। নব্বই শতাংশের কিছু বেশী কানাডিয়ান নারীরা বলেছেন তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে অন্তত একবার নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। নব্বই শতাংশ পুরুষও স্বীকার করেছেন তারা অন্তত একটি কর্মক্ষেত্রে সংঘটিত যৌন নির্যাতনের কথা জানেন বা নিজে সাক্ষী ছিলেন। কর্মক্ষেত্রের এই যৌন হয়রানীই বোধহয় সেই প্রভাবকগুলোর একটা, যেগুলোর কারণে কানাডিয়ান নারীরা খুব ঘন ঘন চাকুরী পরিবর্তন করেন।[১৩]

Human Resources Professionals Association এর জরিপে উঠে এসেছে যে প্রতি তিন জনে একজন কানাডিয়ান নারী কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার হন। পুরুষরাও খুব বেশি পিছিয়ে নেই। প্রতি ১০০ জন পুরুষের ভেতর ১২ জন কর্মক্ষেত্রের যৌন নির্যাতনের শিকার হন। এই রিপোর্টেও উঠে এসেছে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের ঘটনার রিপোর্ট করা হয়না। বলাই বাহুল্য #metoo মুভমেন্টের পর এই ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে আসছে।– লস্টমডেস্টি।[১৪,১৫,১৬])

এখানের মানুষ খুবই আত্মকেন্দ্রিক এবং ক্যারিয়ার-ওরিয়েন্টেড। ছেলে-মেয়ে আঠারো-বিশ বছর বয়স হলেই বাবা-মা আশা করে ছেলে-মেয়েরা আলাদা হয়ে যাবে তাদের থেকে। সারা জীবন আত্মকেন্দ্রিক থাকার কারণে বুড়ো বয়সে গিয়ে দেখা যায় এরা একদম একা হয়ে গিয়েছে। হয় ওল্ড হোমে গিয়ে দিন কাটাতে হয়, অথবা নিজের

Scanned by CamScanner

বাড়িতেই প্রায় নিঃসঙ্গ ভাবে শেষ দিন গুলো পার করতে হয়। নিঃসন্তান এক বৃদ্ধাকে চিনি, যার বাবা-মা, স্বামী কেউ বেঁচে নেই, নেই কোনো আত্মীয়-স্বজন। তার দিন কাটে একলা অ্যাপার্টমেন্টে। তার নিঃসঙ্গতার কথা চিন্তা করলে দম আটকে আসে আমার।

(প্রতি ৩ জন কানাডিয়ানদের ১ জন ভয়াবহ মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন। কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা ভয়াবহ। ছোট্ট বয়সটাতেই হতাশা,অবসাদ, ক্লেদ জাঁকিয়ে বসেছে এমন কিশোর কিশোরী তরুণ, তরুণীর সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। প্রতি পাঁচজনের একজন মনোযাতনায় ভুগছে। এদের সামনে লম্বা একটা সময় পড়ে আছে, জীবনতো শুরুই হয়নি কিন্তু এরই মধ্যে তাদের পৃথিবী এতোটাই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে যে অনেকে আত্মহত্যা করে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। এই বয়সের কানাডিয়ানদের মৃত্যুবরণের দ্বিতীয় শীর্ষ কারণ হল আত্মহত্যা। ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ Dr. Jean Clinton সতর্ক সঙ্কেত জানিয়ে বলছেন, তরুণ তরুণীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মানসিক সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। অবশ্যই বলতে হবে আমাদের সমাজ এক মহাসঙ্কটের ভেতর পড়েছে'।– লস্টমডেস্টি [১৭,১৮,১৯]।)

যেহেতু ধর্মীয় বিধি-নিষেধ নেই, তাই এদের কাছে প্রেম-ভালোবাসার সংজ্ঞাও ভিন্ন। সম্ভাব্য পার্টনারের সাথে প্রথমেই শারীরিক সম্পর্ক করে, তারপর চিন্তা করে দেখে ভালোবাসা যাবে কি না, সম্পর্ক চালালে ক্যারিয়ারের ক্ষতি হবে কি না। ক্যারিয়ার এবং স্বার্থ প্রাধান্য পায় বলে সম্পর্কগুলোও হয় ঠুনকো, ভাংতে সময় লাগে না। রিসার্চের কাজে আমাকে কয়েক জায়গায় কাজ করার দরকার হয়েছে। এক জায়গার অভিজ্ঞতা বলি। ওখানে আমার সাথে আরো ৩-৪ জন ছেলে কাজ করতো। আমি ওখানে নতুন, আর ঐ ছেলেগুলোকে বেশ ফ্রেন্ডলি মনে হত বলে ভাবতাম এদের সাথে ভাব জমাতে পারলে ভালই হবে। কাজের ফাঁকে ওরা গল্প করতো নিজেরা নিজেরা। একদিন শুনি যে একজন আরেকজনকে এক মেয়ের ব্যাপারে বলছে। মেয়েটার নাম মনে নাই, ধরে নিই লুসি। তো শুনলাম ছেলেটা বলছে, “আরে আমি লুসিকে কোনভাবেই বুঝাতে পারছি না যে ও আমার গার্লফ্রেন্ড না। ও মনে করছে আমরা কাপল। অথচ আমরা কাপল না! মাত্র দুইবার একসাথে রাত কাটিয়েছি আমরা! আর ও কি না মনে করছে আমি ওর বয়ফ্রেন্ড হয়ে গেছি।”

বলা বাহুল্য, ছেলেটার ভাষা এতটা ভদ্র ছিল না। এই আলাপ শোনার পর ঐ ছেলেগুলোর সাথে আমার খাতির জমানোর শখ ঐ মুহূর্তেই উবে গেছে।

মানুষ সব সময় একটা গোল বা লক্ষ্য মাথায় রেখে আগাতে থাকে। আপনি যখন

Scanned by CamScanner

স্কুলে পড়ছেন, তখন আপনার লক্ষ্য থাকে যে সামনের পরীক্ষাতে ভালো করা, এবং সামনের পরীক্ষাগুলোতে ভালো করলে ভালো একটা কলেজে চান্স পাবেন। একইভাবে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, চাকরি, প্রমোশন, বিয়ে, সন্তান, আরো প্রমোশন।

কিন্তু তারপর? আল্টিমেট গোল বা চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?

আস্তিক আর নাস্তিকের মধ্যে তফাৎটা এখানেই। আস্তিকের পরকালে বিশ্বাস আছে বলে তার অন্য সব লক্ষ্য অর্জন হলেও পরকালের লক্ষ্যটি মাথায় থাকে ঠিকই। কিন্তু নাস্তিক হওয়ার সাইড-ইফেক্টগুলোর একটি হল, কোন চূড়ান্ত লক্ষ্য না থাকা। চাকরি, প্রমোশন ইত্যাদি চলতে চলতে জীবনকে এক পর্যায়ে স্থির মনে হতে থাকে। লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে মানুষ তখন ভালো থাকতে পারে না। যেহেতু "আধুনিক" মানুষ মাত্রই নাস্তিক, তাই এদিকের মানুষের ডিপ্রেশন, মানসিক সমস্যা অত্যন্ত বেশি। আর এই ডিপ্রেশন চরমে পৌঁছে গেলে আত্মহত্যাও করে ফেলে। আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে এরা খুবই বিচ্ছিন্ন থাকে একে অপরের থেকে। এর খারাপ দিক আছে, ভালো দিকও আছে। খারাপ দিক হল, এর ফলে ওরা কেমন জানি যান্ত্রিক হয়ে পড়ে এবং নানাবিধ মানসিক সমস্যায় বেশি ভুগে। ভালো দিক হল, কেউ কারো বিষয়ে নাক গলায় না। মানুষে কে কী ভাবলো, তা নিয়েও বেশি চিন্তা করে না।[1]

এখানের মানুষদের আরো কিছু ভালো দিক হলো তারা সাধারণত বেশ হেল্পফুল। সাহায্য চাইলে যথাসাধ্য সাহায্য করবে, আচার-ব্যবহারে খুবই অমায়িক (বেশির ভাগ সময়েই)। রেসিজম যে একেবারে নাই, তা না, সামান্য পরিমাণে হলেও আছে। কথা-বার্তা বললে সোজা-সাপ্টা কথাই বলে। আমি এখানে আসার পর একজন কানাডিয়ানের সাথে কথা বলতে গেলে যতটা সতর্ক থাকি, তার চেয়ে হাজারগুণে বেশি সতর্ক থাকি কোন বাংলাদেশীর সাথে কথা বলতে গেলে। ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও সত্যি।

এখানের ট্রান্সজেন্ডার, হোমোসেক্সুয়ালদের অভয়ারণ্য, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে

---

[1] আসলে পশ্চিমের এই মানুষগুলো বড্ড ব্যস্ত নিজের ক্যারিয়ার, নিজের স্বার্থ, খোদপরস্তী আর খাহেশাত পূরণে; তাই নিজেকে বাদ দিয়ে অন্যদের দিকে না তাকানোর এবং নিজের স্বার্থের বাহিরে অন্য কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা অথবা কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের বানানো বস্তুবাদী জগতে মুখ ডুবিয়ে রাখা এদের অস্থিমজ্জায় গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু একই বিষয় ইসলাম ও আমাদেরকে শিখিয়েছে নিজের বাদ দিয়ে অন্যের দিকে নজর না দেওয়া। কারণ ইসলামের শিক্ষা প্রত্যেক মানুষই একা। সে এসেছে একা যাবেও একাই। তাই আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের হক যাকে 'হাক্কুল ইবাদ' বলা হয়, সেগুলো পালন ব্যতিরেকে অন্যের দিকে নজর না দেওয়া, অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, নিজের মত করে নিজের অনন্তকালের বাড়ি জান্নাতের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি নেওয়া, হকের জন্য কাউকে পরোয়া না করা, নিন্দুকের নিন্দা আর লৌকিকতার পাল্লায় পড়ে আল্লাহর হককে ভুলে না যাওয়া। এগুলো ইসলামের-ই শিক্ষা। একই কাজ, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বদলে দেয় কাজের মর্মার্থকে, তাই না? - সম্পাদক

Scanned by CamScanner

মুসলিম-বিদ্বেষ দেখে গা জ্বালা করে। লক্ষ্যহীন আত্মকেন্দ্রিক নিঃসঙ্গ মানুষগুলোকে দেখে করুণা হয়। বাংলাদেশ অন্য সব দিক দিয়ে একদম পচে গেলেও পারিবারিক বন্ধন আর মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এসব "উন্নত বিশ্বের" চেয়ে ঢের এগিয়ে।

এখানে অনেক কিছু দেখে-শুনে আরো একটা উপলব্ধি হয়েছে। মুসলিম ঘরে জন্মে, মুসলিম হয়ে থাকতে পারাও আল্লাহ্‌র পক্ষ অনেক বড় নিয়ামত। . . .

> *"অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের আর কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?" [আল কোরআন ৫৫:১৩]*

Scanned by CamScanner

তথ্যসূত্র

[১] Loudspeakers in mosques- https://tinyurl.com/adjew8d

[২] Quebec bans niqab for public services with neutrality law- https://tinyurl.com/yd8swe7r

[৩] Quebec bans Muslim women from wearing face veils on public transport- https://tinyurl.com/ybk6bpow

[৪] Quebec passes bill banning niqab, burka while receiving public services- https://tinyurl.com/y8b8s39u

[৫] Same-Sex Marriage in Canada- https://tinyurl.com/y9nr336q

[৬] TIMELINE | Same-sex rights in Canada-https://tinyurl.com/yaxq5rwt

[৭] Understanding the prevalence of sexual assault in our community is important, here are some statistics to understand the nature of sexual violence https://tinyurl.com/ycxgj5xd

[৮] One in seven sexual assault cases in 2017 deemed 'unfounded': StatsCan https://tinyurl.com/ybjtdl4x

[৯] Police-reported sexual assaults in Canada before and after #MeToo, 2016 and 2017 https://tinyurl.com/yd8kqlbu

[১০] Burczycka, M. and S. Conroy. 2017. "Family Violence in Canada: A Statistical Profile, 2015." Juristat, Vol. 37, No. 1. Ottawa: Statistics Canada. Cat. No. -002-85X.

[১১] Afifi, T., MacMillan, H., Boyle, M., Taillieu, T., Cheung, K., and J. Sareen. 2014. "Child Abuse and Mental Disorders in Canada," Canadian Medical Association Journal, vol. 186, no. 9, pp. 9-1.

[১২] CHILD SEXUAL ABUSE BY K12- SCHOOL PERSONNEL IN CANADA EXECUTIVE SUMMARY https://tinyurl.com/yalakf3z

[১৩] Sexual Harassment in the Workplace- http://tinyurl.com/ctvwqem

[১৪] Workplace Sexual Harassment An 'Epidemic' In Canada: Report- https://tinyurl.com/y9meee8g

[১৫] Workplace Sexual Harassment Poll: Most People Don't Report Incidents https://tinyurl.com/ycryje2m

[১৬] More than half of adult women in Canada have experienced 'unwanted sexual pressure,' online survey suggests- https://tinyurl.com/ycj7dd6r

[১৭] Young Minds: Stress, anxiety plaguing Canadian youth- https://tinyurl.com/ycps7wur

[১৮] Why more Canadian millennials than ever are at 'high risk' of mental health issues https://tinyurl.com/ya6uc68p

[১৯] One-third of Canadians at 'high risk' for mental health concerns: poll https://tinyurl.com/yazjssqw

Scanned by CamScanner

منارة

Scanned by CamScanner

১০ম অধ্যায়

ইসলামে কি আদৌ ধর্ষণের শাস্তি বলে কিছু আছে?

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

Scanned by CamScanner

নাস্তিক প্রশ্নঃ মানুষের জীবন বিধান কুরআনে ব্যাভিচারের সাজা থাকলেও ‘ধর্ষণ’-এর জন্য কোন ধরণের সাজার নির্দেশ নেই (বরং আরো উৎসাহিত করে), কেন?

উত্তরঃ অভিযোগকারী নাস্তিক-মুক্তমনারা বোধ হয় ভুলে গেছে যে ইসলামী শরিয়তের উৎস শুধু কুরআন না। কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসও শরিয়তের উৎস। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ধর্ষণের শাস্তি সাব্যস্ত হয়েছে।

“ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এক মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হলে রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি, তবে ধর্ষণকারীকে হদ্দের শাস্তি দেন।”[১]

অনুরূপ মতন (মূল অর্থ) এর বেশ কয়েকটি হাদিস কুতুবে সিত্তাহ গ্রন্থগুলোতে দেখা যায়।

নাফি (র.) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক ব্যক্তি এক কুমারী মেয়েকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং এর ফলে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। লোকজন ধর্ষণকারীকে আবু বাকর(রা.)-এর নিকট উপস্থিত করলে সে ব্যভিচারের কথা অকপটে স্বীকার করে। লোকটি বিবাহিত ছিল না। তাই আবু বকর(রা.)-এর নির্দেশ মতো লোকটিকে বেত্রাঘাত করা হলো। এরপর তাকে মদীনা থেকে ফাদাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।[১.৫]

লায়স (র) নাফি(র.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সফিয়্যাহ বিনত আবু ‘উবায়দ তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সরকারী মালিকানাধীন এক গোলাম গনিমতের পঞ্চমাংশে পাওয়া এক দাসীর সঙ্গে জবরদস্তি করে ব্যভিচার(ধর্ষণ) করে। তাতে তার কুমারীত্ব মুছে যায়।

‘উমার (রা.) উক্ত গোলামকে কষাঘাত করলেন ও নির্বাসন দিলেন। কিন্তু দাসীটিকে

Scanned by CamScanner

সে বাধ্য করেছিল বলে তাকে কষাঘাত করলেন না।[২]

জোরপূর্বক ব্যভিচারকে ধর্ষণ বলা হয়। ধর্ষণও এক প্রকারের ব্যভিচার। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে ধর্ষণকারীর শাস্তি ব্যভিচারকারীর শাস্তির অনুরূপ। আর তা হচ্ছে— অবিবাহিত ধর্ষকের জন্য কষাঘাত (বেত্রাঘাত) এবং বিবাহিত ধর্ষকের জন্য 'রজম' (পাথর ছুড়ে মৃত্যুদণ্ড)।[৩]

ধর্ষণের অপরাধ প্রমাণের জন্য ৪ জন সাক্ষী আবশ্যক। তা না হলে অনেক সময় নিরাপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পেতে পারেন। তবে যদি সাক্ষী না পাওয়া যায়, তাহলে ডিএনএ টেস্টের প্রমাণের দ্বারা ধর্ষককে শাস্তি দেয়া যেতে পারে।[৪]

এখানে অনেকেই একটি প্রশ্ন করে যে-- অববাহিত ধর্ষকের শাস্তি কি লঘু হয়ে গেল?

আসলে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশেই ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর নেই, ইসলামী শাস্তির প্রয়োগ দেখে মানুষ অভ্যস্ত নয়, এ কারণেই এই প্রশ্ন। অবিবাহিত ধর্ষককে ১০০টি বেত্রাঘাত এর শাস্তি পেতে হয়। এই শাস্তি হয় প্রকাশ্যে। বেত্রাঘাত মোটেও সহজ কোন জিনিস না। এতগুলো আঘাত টানা হজম করা ভয়াবহ কঠিন ও কষ্টের ব্যাপার। যে এই শাস্তির শিকার হয় কেবল সে-ই এটি উপলব্ধি করতে পারে। তা ছাড়া এই শাস্তি হয় প্রকাশ্যে। হাজার হাজার লোকের সামনে এর শিকার হওয়া মানসিকভাবেও অপমানজনক। এই শাস্তি যাকে দেয়া হয় সে শারিরীক ও মানসিক উভয়ভাবেই শাস্তি লাভ করে। কাজেই এটি মোটেও সহজ বা লঘু কোনো শাস্তি নয়।[৫]

যেহেতু এই শাস্তিগুলো প্রকাশ্যে দেয়া হয় (রজম ও বেত্রাঘাত) সমাজে এর একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া হয়। মানুষ প্রকাশ্যে এই শাস্তি প্রত্যক্ষ করে একটা বার্তা পায় যেঃ এই অপরাধ করলে এভাবেই প্রকাশ্যে ভয়াবহ শাস্তি পেতে হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তো সাজা পাচ্ছেই, তার নাম-পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে ফলে এটি তার পরিবারের জন্যও অপমানজনক একটি ব্যাপার। ইসলামী শরিয়তের এই হদ(শাস্তি) বাস্তবায়ন হলে সমাজ থেকে ধর্ষণ ও ব্যভিচারের মত অপরাধগুলো নির্মুল হয়ে যেতে বাধ্য।

ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র অনুযায়ী যে নারীকে ধর্ষণ করা হয় তিনি মোটেও দোষী হবেন না এবং তাকে কোনো প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে না। একজন নারীকে যদি কেউ ধর্ষণ করতে যায়, তাহলে তার পূর্ণ অধিকার আছে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করার। এই আত্মরক্ষা তার জন্য ফরয। এমনকি এ জন্য যদি কোন নারী ধর্ষণে উদ্যত ব্যক্তিকে হত্যাও করেন, তাহলেও এ জন্য তিনি দোষী গণ্য হবেন না।

Scanned by CamScanner

ইমাম ইবনুল কুদামা হাম্বলী (র.) এর আল মুগনী গ্রন্থে এসেছে যে কোন পুরুষ ভোগ করতে উদ্যত হয়েছে ইমাম আহমাদ এমন নারীর ব্যাপারে বলেনঃ

"আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সে নারী যদি তাকে মেরে ফেলে ইমাম আহমাদ(র.) বলেনঃ যদি সে নারী জানতে পারেন যে, এ ব্যক্তি তাকে উপভোগ করতে চাচ্ছে এবং আত্মরক্ষার্থে তিনি তাকে মেরে ফেলেন তাহলে সে নারীর উপর কোন দায় আসবে না।"[আল মুগনী ৮/৩৩১][৬]

নাস্তিক-মুক্তমনারা এরপরেও হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারে যে ধর্ষণের শাস্তির বিধান তো সুন্নাহ বা হাদিসে আছে; কুরআনে তো নেই। জবাবে আমরা মুসলিমরা বলবঃ ইসলামের সকল বিধি-বিধান যে কুরআনে থাকতে হবে ব্যাপারটা এমন নয়। কুরআনের বহু আয়াতে নবী মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ তথা সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ রয়েছে।

"যে লোক রাসুলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি তোমাকে [হে মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)], তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।"[৭]

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"[৮]

"বল- যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমাকে [মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।"[৯]

আর রাসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[১০]

কুরআনের একটি আদেশ হচ্ছে নবী মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ তথা সুন্নাহ অনুসরণ করা। অর্থাৎ সুন্নাহ অনুসরণ করা কুরআন অনুসরণেরই একটি ধাপ বা পর্যায়। যেহেতু কুরআন নির্দেশ দিচ্ছে সুন্নাহ অনুসরণ করার, কাজেই সুন্নাহ অনুসরণ মানেই হচ্ছে কুরআন অনুসরণ। নবী মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণও ব্যাপারটা এভাবেই দেখতেন।

"একবার সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা.) বললেনঃ "আল্লাহর লা'নত সে সব নারীদের উপর যারা দেহাঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যারা করায়; যারা ভ্রু

Scanned by CamScanner

চেঁছে সরু(প্লাক) করে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে; এরা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতকারী।"

এ কথা বনু আসাদ বংশের জনৈক মহিলা শোনে যার নাম ছিল উম্মে ইয়া'কুব। সে ইবন মাসউদের(রা.) নিকট এসে বলেঃ "আমি শুনেছি আপনি অমুককে অমুককে লা'নত করেছেন?"

তিনি বললেনঃ "আমি কেন তাকে লা'নত করব না যাকে আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেন এবং যার কথা আল্লাহর কুরআনে রয়েছে!"

সে বললঃ "আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বললেন তা তো পাইনি!"

তিনি বললেনঃ "তুমি কুরআন পড়লে অবশ্যই পেতে; তুমি কি পড়নি--"

> *"আর রাসুলে তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (সুরা হাশরঃ৫৯)*

সে বললঃ "অবশ্যই।"

তিনি বললেনঃ "নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসব কর্ম থেকে নিষেধ করেছেন।"[১১]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ সুন্নাহতে কোন বিধান থাকলে সেটাকে কুরআনের বিধান বলেই গণ্য করতেন।

হাদিস তথা সুন্নাহর প্রামাণিকতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের জন্য 'হাদিসের প্রামাণিকতা' (সানাউল্লাহ নজির আহমদ) বইটি দেখা যেতে পারে।[১২]

সুন্নাতে সাহাবা বা সাহাবীগণের(রা) আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। আর (জেনে রাখ) তোমাদের ওপর যদি কোনো হাবশী(আবিসিনিয় নিগ্রো) গোলামকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, তবু তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করে চলবে। আর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত এবং সঠিক নির্দেশনাপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করাই হবে তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সমস্ত অবৈধ বিষয়কে এড়িয়ে চলবে। কেননা, প্রতিটি 'বিদআত' (দ্বীনী বিষয়ে নব উদ্ভাবন) হচ্ছে

Scanned by CamScanner

ভ্রষ্টতা।"[১৩]

শরিয়তের দলিল হিসাবে সুন্নাতে সাহাবা বা সাহাবী(রা.)গণের আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত প্রমাণের জন্য খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর(র.) এর 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকিদা' বইয়ের ৫৮-৬২ পৃষ্ঠা এবং 'এহইয়াউস সুনান' বইয়ের ১০২-১০৭ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

এ আলোচনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে, ইসলাম ধর্ষণের ন্যায় জঘন্য অপরাধটির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রেখেছে এমনকি এই অপরাধ নির্মূল করবার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং নাস্তিক-মুক্তমনাদের দাবির কোন ভিত্তি নেই।

Scanned by CamScanner

তথ্যসূত্র

[১] সুনান ইবন মাজাহ, পরিচ্ছদ ১৪/৩০ {বল প্রয়োগে যাকে কিছু করতে বাধ্য করা হয়} হাদিস নং ২৫৯৮

[১.৫] আল-মুওয়াত্তা - ইমাম মালিক, কিতাবুল হুদূদ, হাদিস নং : ১৩০০

[২] সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ ৮৯ {বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করা (كتاب الإكراه)} হাদিস নং ৬৯৪৯

[৩] Ruling on the crime of rape – islamQA (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/72338

[৪] "What is the difference between the ruling on rape and the ruling on fornication or adultery? Can rape be proven by modern methods?" – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/158282
"Can we consider DNA test in case of adultary, in case of fornication(Rape) or instead of 4 witness ?" [Dr. Zakir Naik]
https://www.youtube.com/watch?v=1iqQrj4SFXU

[৫] Description of flogging for an unmarriezd person who commits zina» – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/13233

[৬] "ধর্ষকের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা কি ওয়াজিব?" – islamqa (শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ) https://islamqa.info/bn/4017

[৭] আল কুরআন, নিসা ৪ : ৮০

[৮] আল কুরআন, আহযাব ৩৩ : ২১

[৯] আল কুরআন, আলি ইমরান ৩ : ৩১

[১০] আল কুরআন, হাশর ৫৯ : ৭

[১১] সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৮৮৬

[১২] ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/jFM1ZZ

[১৩] আবু দাউদ ও তিরমিযী; রিয়াদুস সলিহীন :: বই ১ :: হাদিস ১৫৭

Scanned by CamScanner

منارة

Scanned by CamScanner

১১তম অধ্যায়

সাহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রা) এর মুসহাফে দুটি অতিরিক্ত সুরা ছিলো কি?

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

Scanned by CamScanner

প্রখ্যাত সাহাবী উবাই বিন কা'ব(রা) এর মুসহাফের [লিপিবদ্ধ পূর্ণ কুরআন] সুরা সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলে দেশ –বিদেশের খ্রিষ্টান মিশনারী তাদের মিডিয়া ইভানজেলিস্ট, নাস্তিক-মুক্তমনা এবং বিদেশী ওরিয়েন্টালিস্টরা। তারা বিরামহীনভাবে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যে—সাহাবী উবাই বিন কা'ব(রা) এর ব্যক্তিগত মুসহাফে ১১৬টি সুরা ছিল-অর্থাৎ দুইটি 'অতিরিক্ত' সুরা ছিল। এ দ্বারা তার প্রমাণ করতে চায় যে বর্তমান কুরআনের সাথে সাহাবীদের কুরআনে সুরা সংখ্যায় বেশি-কম ছিলো। এভাবে তারা উসমান(রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআনের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। অর্থাৎ কুরআন নাকি যথার্থরূপে সংরক্ষণ করা হয়নি। এহেন প্রশ্ন তোলার অর্থ হচ্ছে ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা।

এই দাবি তোলার জন্য ইসলামবিরোধীরা নিম্নের বর্ণনাটি ব্যবহার করে—

"এবং উবাই(রা) এর মুসহাফে ছিল ১১৬টি (সুরা/অধ্যায়) এবং শেষ থেকে তিনি লিপিবদ্ধ করেন সুরা হাফদ এবং খাল'।"[১]

উল্লেখ্য, 'সুরা' শব্দের অর্থ দেয়াল বা প্রাচীর। তবে কুরআনে সুরা শব্দ দ্বারা অধ্যায় উদ্দেশ্য।

উবাই(রা) তাঁর মুসহাফে যে অতিরিক্ত অংশটুকু লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাও জালালুদ্দিন সুয়ুতি(র) বর্ণনা করেছেনঃ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ.

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমরা শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই, শুধু আপনার কাছেই ক্ষমা চাই, আপনার গুণগান করি, আপনার অকৃতজ্ঞ হই না, আর

Scanned by CamScanner

যারা আপনার অবাধ্য তাদের থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হই। হে আল্লাহ, আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, শুধু আপনার নিকট প্রার্থনা করি, শুধু আপনার প্রতি নত হই (সিজদাহ করি), আপনার দিকে ধাবিত হই। আর আমরা আপনার কঠিন শাস্তিকে ভয় করি, আপনার দয়ার আশা রাখি। নিশ্চয়ই আপনার শাস্তি তো অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত।[2]

কোন কোন রেওয়ায়েতে সামান্য কিছু শব্দের পার্থক্য দেখা যায়।

জালালুদ্দিন সুয়ুতি(র) এরকম অনেক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যাতে উল্লেখ আছে যে সাহাবীগণ(রাদি) নামাযে এই "সুরা"দ্বয় পাঠ করেছেন। যে শব্দগুলোকে কুরআনের সুরার সাথে মিলিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে জিব্রাইল (আ) কর্তৃক রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শেখানো দোয়া।

ইমাম বাইহাকী(র) বর্নণা করেছেনঃ

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَهُ جِبْرَئِيلُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ فَسَكَتَ، فَقَالَ: « يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَّابًا وَلَا لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بَعَثَكَ رَحْمَةً، وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨] ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ: اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ...

অর্থঃ "যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুদ্বার গোত্রের বিরুদ্ধে দোয়া করছিলেন, জিব্রাঈল(আ) তাঁর নিকট আসলেন এবং তাঁকে থামতে ইঙ্গিত করলেন, তাই তিনি থেমে গেলেন। এরপর জিব্রাঈল (আ) বললেন, "হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আল্লাহ আপনাকে দোষ দিতে বা অভিশাপকারী করে প্রেরণ করেননি বরং তিনি আপনাকে দয়াস্বরূপ পাঠিয়েছেন। আর তিনি আপনাকে আযাব আনবার জন্যও পাঠাননি। {এরপর বললেন} "তিনি(আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করবেন কিংবা শাস্তি দেবেন এটা আপনার সিদ্ধান্ত নয়, আর নিশ্চয়ই তারা তো জালিম।" (আলি ইমরান ৩:১২৮)

এরপর তিনি তাঁকে কুনুতটি শিক্ষা দিলেনঃ "হে আল্লাহ, আমরা শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই,... ..."।[৩]

আনাস(রা) কে আব্বান বিন আবু আয়াশ এ কুনুতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেনঃ

وَاللهِ إن أُنْزِلَتَا إِلَّا من السَّمَاء

অর্থঃ আল্লাহর শপথ, এগুলো তো আসমান থেকে নাজিল হয়েছে।[৪]

Scanned by CamScanner

অতএব আমরা দেখলাম যে, নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন জালিম মুদ্বার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দোয়া করছিলেন, তখন ফেরেশতা জিব্রাঈল(আ) এসে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে আল্লাহ তাঁকে দয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এরপর তিনি তাঁকে সেই কুনুতটি (নামাজে পাঠ করা দোয়া) শিখিয়ে দেন। যা বর্ণনা করেছেন

জালালুদ্দিন সুয়ুতি(র) তাঁর আল ইতকানের বিভিন্ন বর্ণণায়।[৫]

উমার(রা), উবাই(রা), আবু মুসা(রা), আশআরী(রা) নামাযে এই দোয়া পড়তেন বলে বিবরণ উল্লেখ করেছেন। যদিও নামাযে যে কোনো দোয়া করা যায়, কিন্তু যেহেতু জিব্রাঈল(আ) সরাসরি এসে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ঐ কুনুত শিখিয়েছেন, সাহাবীগণও(রা) নামাজে সেই কুনুতটি পড়তে পছন্দ করতেন, অনেক সাহাবী থেকে এর বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি কিভাবে কুরআন নাজিলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উপায়ে বাক্যগুলো জিব্রাঈল(আ) এর দ্বারা মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে শেখানো হয়েছে। এ কারণে সুন্নাহপ্রেমী সাহাবীগণ নামাজে সে বাক্যগুলো কুনুত হিসাবে পড়তে ভালোবাসতেন। এই কুনুতটি বিতর নামাজে পড়া হয়। ফজরে কুনুত পড়বার বিবরণও পাওয়া যায়। সাহাবীগণ যেভাবে নামাজ পড়তেন, বর্তমান মুসলিমরাও হুবহু সেভাবেই নামাজ পড়েন। বর্তমান মুসলিমরাও নামাজে কুনুত পাঠ করে থাকেন। ইসলামবিরোধীরা যে এই শব্দগুলোকে “হারিয়ে যাওয়া সুরা” বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এর দ্বারা এই তত্ত্বের অসারতাই প্রমাণিত হয়।

ওরিয়েন্টালিস্ট, খ্রিষ্টান মিশনারী এরা বলতে চায় যে—বর্তমানে মুসলিমরা যে

Scanned by CamScanner

কুরআন পড়ে, তা খলিফা উসমান বিন আফফান(রা) কর্তৃক সংকলিত হয়েছে এবং সেই কুরআনের সাথে সেই সময়কার অর্থাৎ প্রথম যুগের মুসলিমদের কুরআনের সাথে পার্থক্য ছিল। তিনি নাকি শুধুমাত্র ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা স্বেচ্ছাচারীভাবে কুরআন সংকলন করেছেন, অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মিল রেখে সংকলন করেননি। এর প্রমাণ হিসাবে তারা উবাই(রা) এর মুসহাফ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত এবং সাহাবীদের নামাজে কুনুত পড়বার রেওয়াতগুলো অপব্যাখ্যা করে। কিন্তু তাদের এই বাজে কথাকে সহজেই অসার প্রমাণ করা যায় কেননা উবাই(রা) এবং অন্যান্য সাহাবীদের কেউ কখনো এই দাবি করেননি যে ঐ বাক্যগুলো কুরআনের অংশ। উসমান(রা) এর যদি কুরআন থেকে কোন বাক্য সরানোর ইচ্ছা আসলেই থাকতো (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে তিনি নিজেই কেন সেই বাক্যগুলো নামাজে পাঠ করতেন? উবাই(রা) এর মুসহাফের যে অতিরিক্ত অংশগুলো উসমান(রা) কুরআন থেকে বাদ দিয়েছেন বলে ইসলামবিরোধীরা অভিযোগ তোলে, উসমান(রা) স্বয়ং সেই বাক্যগুলো নামাজে পাঠ করতেন। এবং অন্য সকল সাহাবীর মতই তা কুনুত হিসাবে পাঠ করতেন; কুরআনের অংশ হিসাবে নয়। কোনো বাক্য যদি তাঁর বাদ দেবারই ইচ্ছা থাকতো, তাহলে তিনি নিজে কেন নামাজে সেই বাক্যগুলোই পাঠ করবেন??

"হুসাইন বিন আবদুর রহমান বর্নণা করেনঃ তিনি উসমান জিয়াদের পিছনে নামাজ আদায় করেছেন। নামাজের পরে তিনি তাঁকে বলেন যে, তিনি সেই বাক্যগুলো দ্বারা কুনুত পড়েছেন। অতঃপর বলেন, উমার বিন খাত্তাব(রা) এবং উসমান বিন আফফান(রা)ও এভাবেই তা আদায় করতেন।"[৬]

বিরোধীরা এবার হয়তো বলবে—তাহলে উবাই বিন কা'ব(রা) কেন তাঁর মুসহাফে অতিরিক্ত 'সুরা' দুইটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যদি তা কুরআনের অংশ না হয়?

এ বিষয়ে প্রথমেই যেটি বলবঃ 'সুরা' শব্দের অর্থ অধ্যায়। উবাই(রা) এর ব্যক্তিগত

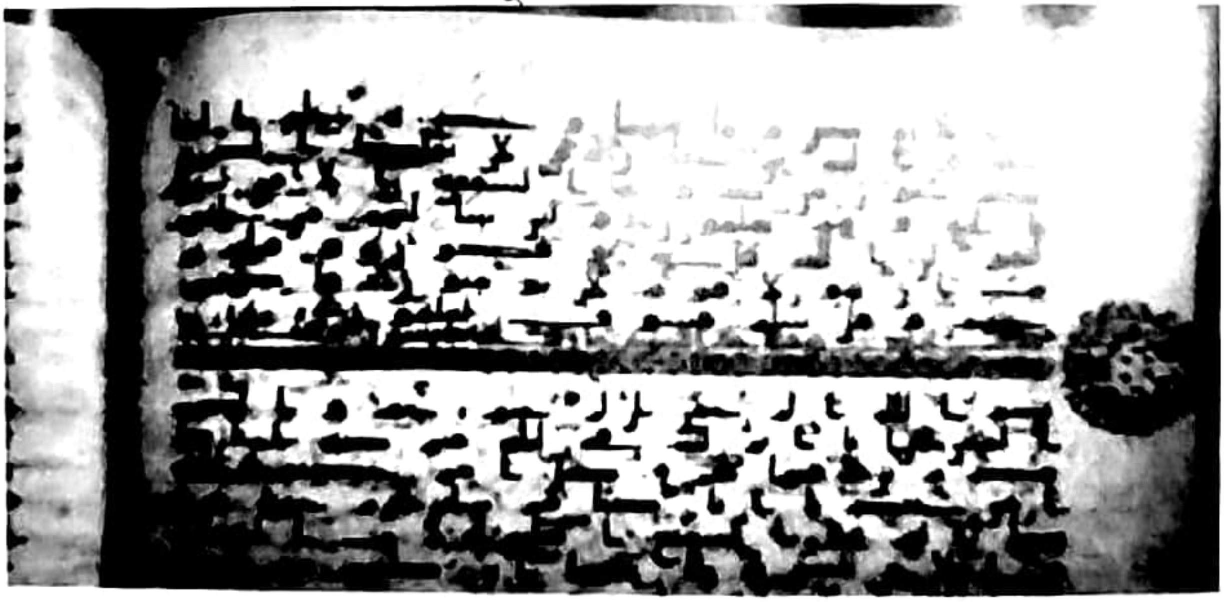

Scanned by CamScanner

মুসহাফটিতে মোট অধ্যায় বা সেকশন ছিল ১১৬টি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তার সকল অধ্যায় বা সুরা কুরআনের অংশ।

মুহাম্মাদ আবদুল আজিম আল জুরকানী(র) এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেনঃ

> *"যে সকল সাহাবীর এক বা তার অধিক ব্যক্তিগত কপি ছিল, তাঁরা সে সমস্ত কপিতে এমন কিছুও উল্লেখ করতেন যা কুরআনের অংশ ছিল না। তাঁদের লিপিবদ্ধ এই অতিরিক্ত অংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুরআনের যে অংশগুলো বোঝা কঠিন হত সেগুলোর ব্যাখ্যা (তাফসির) কিংবা দোয়া, যেগুলো অনেকটা কুরআনের দোয়ার মতই ছিল। সেই দোয়াগুলো নামাজে কুনুত হিসাবে পড়া হত। এবং তাঁরা জানতেন এগুলো কুরআনের অংশ নয়। লেখার সরঞ্জামের অভাবের জন্য তারা এমনটি করতেন। এবং তারা শুধুমাত্র নিজেদের পড়বার জন্য কুরআন লিখতেন কাজেই এগুলো বোঝা তাঁদের জন্য সহজ ছিল এবং কুরআনের সাথে মিশে যাবার ভয় ছিল না।"*[৭]

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলোর দ্বারা কুনুত পড়তেন এবং উমার(রা), আলী(রা) এবং অন্যান্য সাহাবীদের(রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কে শিখিয়েছেন। তাঁরা সবাই এগুলোর দ্বারা নামাজে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। মুসলিমগণ তা শুনেছেন এবং তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন।[৮]

عن عطاء أن عثمان بن عفان لما نسخ

القرآن في المصاحف أرسل إلى أبي بن كعب، فكان يملي على زيد بن ثابت وزيد

يكتب ومعه سعيد بن العاص يعربه، فهذا المصحف على قراءة أبي وزيد

আতা(র) থেকে বর্ণিত; যখন কুরআন মুসহাফে লিপিবদ্ধ করা হবে, উসমান বিন আফফান(রা) উবাই(রা) এর নিকট প্রেরণ করলেন। অতএব তিনি যায়িদ বিন সাবিত(রা) এর নিকট বর্ণনা করলেন এবং যায়িদ লিপিবদ্ধ করলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সাঈদ বিন আস(র), হরকত যুক্ত করার জন্য। অতএব এটি উবাই ও যায়িদের কিরাত অনুযায়ী মুসহাফ।[৯]

এর দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে, বর্তমানে আমরা ১১৪ সুরার যে মুসহাফ পাঠ করি, তা স্বয়ং উবাই(রা) বর্ণিত ছিল এবং তাঁর কিরাতও ভিন্ন কিছু ছিল না। ফলে সামান্যতম সন্দেহেরও আর অবকাশ থাকলো না যে তাঁর লিখিত ব্যক্তিগত

Scanned by CamScanner

কুরআনে বর্তমান কুরআনের থেকে বেশি কিছু ছিলো না যাকে তিনি কুরআনের অংশ বলে গণ্য করতেন।

এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

http://www.icraa.org/

http://www.letmeturnthetables.blogspot.com/

Scanned by CamScanner

তথ্যসূত্র

[১] আল ইতকান, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬

[২] আল ইতকান, জালালুদ্দিন সুয়ুতি ১/২২৭

[৩] সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকী, হাদিস নং ৩১৪২

[৪] দুররে মানসুর, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৯৫

[৫] দেখুন আল ইতকান ১/২২৭-২২৮

[৬] মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবাহ, হাদিস নং ৭০৩২

[৭] মানাহিল আল ইরফান ফি উলুমুল কুরআন, পৃষ্ঠা ২২২

[৮] আল কুরআন ওয়া নাক্বদ মাতা'ইন আর রুহবান, পৃষ্ঠা ২৭৭

[৯] কানজুল উম্মাল, খণ্ড ২, হাদিস ৪৭৮৯

Scanned by CamScanner

১২তম অধ্যায়

সাত হারফ কি কুরআনের একাধিক ভার্সন?

মুহাম্মাদ শাকিল হুসাইন

Scanned by CamScanner

কুরআন নিয়ে কাফির-মুশরিকদের অভিযোগ সেই কুরআন নাযিলের সময় থেকেই বিদ্যমান ছিলো। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান যুগের প্রাচ্যবিদ, নাস্তিক আর খ্রিস্টান মিশনারীরা যোগ দিয়েছে। কুরআনের ব্যাপারে তাদের অভিযোগ অনেক। সেই অনেক অনেক অভিযোগের মধ্য থেকে একটি অভিযোগ অনেকেই করে থাকে সাবআতুল আহরুফ বা কুরআনের ৭ হারফ নিয়ে। তারা প্রশ্ন তুলে থাকে এবং অভিযোগ করে থাকে এটা নাকি কুরআনের বিভিন্ন ভার্সন বা সংস্করণ (নাউযুবিল্লাহ)। অনেক সময়ে খ্রিষ্টান মিশনারী কিংবা নাস্তিক মুক্তমনারা বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত প্রাচীন কুরআনের কপির প্রচার করে থাকে যেগুলোতে কিছু শব্দ ও বাক্য বর্তমানে প্রচলিত কুরআন থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এভাবে তারা আল কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, তারা বলতে চায় যে কুরআন ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি এবং সাহাবীগণ আল কুরআনকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। আসুন এইসব অভিযোগের স্বরূপ সন্ধানে যাওয়া যাক।

হারফ বহুবচনে আহরুফ(ج. أحرف /حرف) অর্থ কিনারা, তট, কূলভূমি ইত্যাদি।[১]

যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা প্রান্তে দাঁড়িয়ে (দ্বিধার সঙ্গে) আল্লাহর ইবাদাত করে। (সূরা হাজ্জ, ২২:১১)

সাত হারফে কুরআন নাযিলের বিষয়টি অনেক হাদিস দ্বারা প্রমানিত।

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(صلى الله عليه وسلم) বলেছেন,

"জিবরাঈল (আ) আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে

Scanned by CamScanner

অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং পুনঃ পুনঃ অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য পাঠ পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। **অবশেষে তিনি সাত হরফে তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন।**"[২]

অর্থাৎ, আল কুরআনের এই ৭ হারফ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(صلى الله عليه وسلم) কর্তৃক অনুমোদিত।

এই সাত আহরুফ বা হারফসমুহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উলামারা অনেক আগে থেকেই এই সাত হারফ দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলেন,

أحسن الأقوال مما قيل في معناها أنها سبعة أوجه من القراءة تختلف باللفظ وقد تتفق بالمعنى وإن اختلفت بالمعنى: فاختلافها من باب التنوع والتغاير لا من باب التضاد والتعارض

*"এই বিষয়ে উলামাদের থেকে বর্ণিত সর্বাধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো যে এই সাবআতুল আহরুফ কিরাতের সাতটি বিশেষ পদ্ধতি যা শব্দের দিক থেকে আলাদা হলেও অর্থের দিক থেকে এক। আর যদি ও অর্থের দিক থেকে একে অপরের থেকে ভিন্নও হয়, তবে তা বৈচিত্র্যের দিক থেকে, **সামগ্রিকভাবে** একে অপরের বিরোধী নয়।"[৩]*

মাওলানা তাকী উসমানী (হাফি) এই বিষয়ে বলেন,

"আমার দৃষ্টিতে কুরআনুল কারীমের "সাত হরফ"-এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো, যা হাদীসে "হরফের বিভিন্নতা" দ্বারা "কেরাতের বিভিন্নতা" কে বুঝানো হয়েছে। আর "সাত হরফ" দ্বারা "কেরাতের বিভিন্নতার" সাত প্রকারকে বুঝানো হয়েছে। তাইতো কেরাতগুলো যদিও সাতের চেয়ে বেশী, কিন্তু এই কেরাতগুলোর মাঝে যে মতানৈক্য পাওয়া যায় তা সাত প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।"[৪]

আমরা কুরআনের হারফ সাতটির সামান্য পরিচয় জানবো ও এই সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ দেখে নেবো।

কুরআনের হারফ সাতভাবে ভিন্ন হতে পারেঃ

(১) ভিন্ন শব্দে একই অর্থ প্রকাশ;

(২) শব্দ ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য হওয়া:

Scanned by CamScanner

(৩) শব্দের যোজন-বিয়োজনে অর্থের অভিন্নতা;

(৪) শব্দে আগ-পিছ হওয়া ও অর্থের অভিন্নতা;

(৫) ইরাবের ভিন্নতা ও অর্থের অভিন্নতা;

(৬) ওয়াকফে ভিন্নতা; ও

(৭) উচ্চারণে ভিন্নতা।

(১) ভিন্ন শব্দে একই অর্থ প্রকাশঃ

সাত হারফের প্রকারভেদের একটি হলো ভিন্ন শব্দ তবে একই অর্থ প্রকাশ করবে। যেমন -

আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ

হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও। (সূরা হুজুরাত, ৪৯:৬)

এটি হচ্ছে এই আয়াতের আমাদের পরিচিত কিরাতের ইবারাত (মূল টেক্সট)। উপরে মোটা অক্ষরে আন্ডারলাইন করা শব্দটি হলো ফাতাবাইইয়ানু (فَتَبَيَّنُوٓا) যার অর্থ হলো পরীক্ষা করে দেখবে, কিন্তু অন্যান্য কিছু কিরাতে এই ফাতাবাইইয়ানু (فَتَبَيَّنُوٓا) শব্দটির স্থলে এসেছে ফাতাছাব্বাতু (فتثبتوا)।

অর্থাৎ, পরিচিত কিরাতঃ (إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا)

ভিন্ন কিরাতঃ (إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فتثبتوا)

ফাতাবাইইয়ানু (فَتَبَيَّنُوٓا) ও ফাতাছাব্বাতু (فتثبتوا) এই দুটি শব্দের অর্থই এক তা হলো পরীক্ষা করে দেখা, প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, আরবরা নুকতা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলো না তাই আমরা যদি ফাতাবাইইয়ানু ও ফাতাছাব্বাতু শব্দ দুইটিকে নুকতা ছাড়াই লেখি তবে দুটি শব্দই একই রকম দেখাবে।

(২) শব্দে ও অর্থে উভয়তেই পার্থক্য হওয়াঃ

সাত হারফের মধ্যে ২য় প্রকার হলো যেখানে শব্দ ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য

Scanned by CamScanner

পরিগনিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

আপনি যখন সেখানে বিশাল নেয়ামতরাজি ও সাম্রাজ্য দেখতে পাবেন। (সূরা ইনসান, ৭৬:২০)

এখানে মুলক (مُلْكً) অর্থ সাম্রাজ্য। তবে কিছু কিছু কিরাতে মূলক(مُلْكً) শব্দের পরিবর্তে মালিক (مالك) অর্থাৎ, সম্রাট শব্দ এসেছে। অর্থাৎ,

পরিচিত কিরাত- (وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا)

আপনি যখন সেখানে বিশাল নেয়ামতরাজি ও সাম্রাজ্য দেখতে পাবেন। (সূরা ইনসান, ৭৬:২০)

ভিন্ন কিরাত- (وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمالكا كَبِيرًا)

আপনি যখন সেখানে বিশাল নেয়ামতরাজি ও মহান সম্রাটকে দেখতে পাবেন।

দুটি শব্দ পরিপূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে। তবে সত্য কথা হলো এই অর্থের পরিবর্তন মোটেও দোষনীয় নয়। কেননা মুলক বা সাম্রাজ্য দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হচ্ছে আর মালিক দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হচ্ছে। মালিককে দেখা বলতে আল্লাহর দর্শনকে বুঝানো হচ্ছে। দুটি শব্দের অর্থই ইসলামী আকীদার সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই অর্থের ভিন্নতা এখানে মোটেই সমস্যার কারণ নয়।

(৩) শব্দে যোজন-বিয়োজন তবে অর্থের অভিন্নতাঃ

কখনো কখনো শব্দে যোজন বা বিয়োজনের কারণে পার্থক্য ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

আল্লাহ বলেন,

وَلسَّـٰبِقُونَ لْأَوَّلُونَ مِنَ لْمُهَـٰجِرِينَ وَلْأَنصَارِ وَلَّذِينَ تَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ للَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا لْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ لْفَوْزُ لْعَظِيمُ

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (সূরা তাওবা, ৯:১০০)

Scanned by CamScanner

আমরা কুরআনে অন্যান্য অনেক স্থানেই জান্নাতের নদীর বর্ণনায় 'তাজরী মিন তাহতিহাল আনহার' এর উল্লেখ পাই শুধু এই আয়াতটি ছাড়া যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতের নদীর বর্ণনায় "তাজরী তাহতিহাল আনহার (تَجْرِى تَحْتَهَا لْأَنْهَـٰرُ) ব্যবহার করেছেন। তবে অন্য কিছু কিরাতে এই স্থলেও তাজরী মিন তাহতিহাল আনহার(تَجْرِى من تَحْتَهَا لْأَنْهَـٰر) এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

অর্থাৎ,

পরিচিত কিরাতে- (وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا لْأَنْهَـٰر)

ভিন্ন কিরাতে- (وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى من تَحْتَهَا لْأَنْهَـٰر)

এই দুই কিরাতেই আয়াতের অর্থের সামান্যও পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শব্দের হয় যোজন অথবা বিয়োজন ঘটে থাকে।

(৪) শব্দের আগ-পিছ হওয়া এবং অর্থ অপরিবর্তিত থাকাঃ

(ক) আল্লাহ বলেন,

إِنَّ للَّهَ شْتَرَىٰ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ لْجَنَّةَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ للَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى لتَّوْرَىٰةِ وَلْإِنجِيلِ وَلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ للَّهِ فَـٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ لَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ لْفَوْزُ لْعَظِيمُ

আল্লাহ মুসলিমদের থেকে তাদের জান ও মালে এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তার সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (সুরা তাওবা, ৯:১১১)

এখানে আন্ডারলাইন করা দুটি শব্দ দেখতে পাচ্ছি যা হলো ফাইয়াকতুলুনা ওয়া ইয়ুকতালুন (فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) অর্থাৎ, তারা মারে ও মরে। তবে অন্য কিছু কিরাতে এই দুটি শব্দ আগে-পিছে হয়েছে। অর্থাৎ, ফাইয়ুকতালুনা ওয়া ইয়াকতুলুন (فَيُقتَلُونَ و يَقتُلُون) অর্থাৎ, তারা মরে ও মারে।

অর্থাৎ,

পরিচিত কিরাত- (يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ للَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ)

ভিন্ন কিরাতে- (يقتلون في سبيل الله فَيُقتَلُونَ و يَقتُلُون)

Scanned by CamScanner

(৫) ইরাবে মতপার্থক্য ও অর্থে অভিন্নতাঃ

ইরাব বলতে আরবী শব্দের শেষের হারাকাত নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বোঝায়। আরবীতে ইরাব তিন প্রকার যথা মারফু, মানসুব ও মাজরুর।

আল্লাহ বলেন,

ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

তিনি আল্লাহ; যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সবকিছুর মালিক। কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব। (সূরা ইবরাহীম, ১৪:২)

আন্ডারলাইন করা অংশটি আল্লাহি(ٱللَّهِ)। শব্দটির সঙ্গে ছোট হা এর নিচে কাসরাহ বা যের হয়ে আল্লাহি হয়েছে অর্থাৎ, এই শব্দটি মাজরুর অবস্থায় আছে। তবে কিছু কিছু কিরাতে এখানে আল্লাহি(ٱللَّهِ) এর স্থলে দ্বাম্মাহ বা পেশ দ্বারা মারফু ভাবে আল্লাহু (ٱللَّهُ) ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ,

পরিচিত কিরাতে- (ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ)

ভিন্ন কিরাতে- (ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ)

অর্থে কোনো ভিন্নতা হয়নি।

(৬) ওয়াকফে মতপার্থক্যঃ

ওয়াকফ বলতে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে থামার নির্দেশকে বোঝায়। বিভিন্ন কিরাতে এই ওয়াকফে মতপার্থক্য হয়েছে। যেমন,

আল্লাহ বলেন,

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

(ইউসুফ আ.) বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানদের চাইতে অধিক মেহেরবান। (সূরা ইউসুফ, ১২:৯২)

এই আয়াতে আমাদের পরিচিত কিরাতে ওয়াকফ হবে (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ) এর পরে। তবে কিছু কিরাতে ওয়াকফ করা হয়েছে (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ) এর পরে।

অর্থাৎ,

Scanned by CamScanner

পরিচিত কিরাতে- (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ)

ভিন্ন কিরাতে- (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ؛ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আলাইকুম (عَلَيْكُمْ) শব্দটির পরে ওয়াকফ হয়েছে আর আলইয়াওমা (الْيَوْمَ) শব্দটি পরের আয়াতের শুরুতে যোগ হয়েছে। তখন এর অর্থ একটু ভিন্ন হবে পূর্বেরকার অর্থ থেকে। আর তা হলো-

"তোমাদের উপর (পূর্বের আল ইয়াওমা কথাটি না থাকায় "আজ" হবেনা) কোনো অভিযোগ নেই, আজ (পূর্বের অনুবাদে "আজ" শব্দটি এখানে ছিলো না) আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।"

(৭) উচ্চারণে পার্থক্যঃ

যেমন,

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

আর সে [নুহ(আ)] বলল, 'তোমরা এতে আরোহণ কর। এর চলা ও থামা হবে আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা হুদ ১১:৪১)

এই আয়াতে আন্ডারলাইনকৃত মাজরাহা (مَجْرَاهَا) শব্দকে আরবীতে অনেকে 'মাজরেহা' ও উচ্চারণ করে থাকেন। এমনি ভাবে আরবী হরফ 'সিন'(س) ও সোয়াদ (ص) এর উচ্চারণে আরবদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণে অর্থের কোনোই পরিবর্তন সাধিত হয়না।

এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মুলনীতি মনে রাখতে হবে যে, এই সাত ধরনের হারফের কিরাত সবগুলোই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুমোদিত ও তাঁর থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমানিত। এর প্রমান নিম্নের হাদিসটি থেকে পাই-

উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবন হাকীম (রা) কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তার কিরাত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাত পাঠ করেছেন; অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।

Scanned by CamScanner

তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম,তোমাকে এ সূরা যে ভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি।

তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে উমর! তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফে ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ কর।[৫]

এ রকমটা করা হয়েছে উম্মাতের জন্যেই, তাদের কুরআন তিলাওয়াতে সহজীকরণের জন্যেই। নিম্নের বর্ণনা দুটিতে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

উবাই ইবন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। সে এমন এক ধরণের কিরাত করতে লাগল আমার কাছে অভিনব মনে হল। পরে আর একজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতে ভিন্ন ধরণের কিরাআত করতে লাগল। সালাত শেষে আমরা সবাই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে গেলাম । আমি বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিরাত করেছে যা আমার কাছে অভিনব ঠেকেছে এবং অন্যজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী জন হতে ভিন্ন কিরাত পাঠ করেছে। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উভয়কে (পাঠ করতে) নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই পাঠ করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দু-জনের (কিরাতের) ধরনকে সুন্দর বললেন। ফলে আমার মনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কুরআনের প্রতি মিথ্যা অবিশ্বাস ও সন্দেহের উন্মেষ দেখা দিল। এমন কি জাহিলী যুগেও আমার এমন খটকা জাগেনি। আমার ভেতরে সৃষ্ট খটকা অবলোকন করে

Scanned by CamScanner

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার বুকে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম এবং যেন আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মহা মহীয়ান আল্লাহর দিকে দেখছিলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন-, ওহে উবাই! আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন এক হরফে তিলাওয়াত করি। আমি তখন তাঁর কাছে পুনরায় অনুরোধ করলাম আমার উম্মাতের জন্য সহজ করুন। দ্বিতীয়বার আমাকে বলা হল যে, দুই হরফে তা তিলাওয়াত করবে। তখন তাঁর কাছে আবার অনুরোধ করলাম, আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিতে। তৃতীয়বার আমাকে বলা হল যে সাত হরফে তা তিলাওয়াত করবে এবং যত বার আপনাকে জবাব দিয়েছি তার প্রতিটির বদলে আপনার জন্য একটি সাওয়াল! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় প্রার্থনাটি বিলম্বিত করে রেখেছি সে দিনের জন্য যে দিন সারা সৃষ্টি এমন কি ইবরাহীম (আঃ) ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হবেন। [৬]

উবাই ইবন কা'ব (রা-) থেকে বর্ণিত যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনূ গিফারের জলাভূমি (ডোবা)-র কাছে ছিলেন। উবাই (রা-) বলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকটে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন যে আপনার উম্মাত এক ধরণের কুরআন পাঠ করবে । তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি আল্লাহর কাছে তার মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি । আমার উম্মাত তো এ হুকুম পালনে সমর্থ হবে না । পরে জিবরাঈল (আঃ) দ্বিতীয়বার তার কাছে আগমন করে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত দু'ধরণের কুরআন পাঠ করবে । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি আল্লাহর সকাশে তার মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার উম্মাত তো তা পালনে সমর্থ হবে না । তারপর তিনি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত তিন হরফে কুরআন পাঠ করবে । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি আল্লাহর সমীপে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মাত তো এটি পালনের সমর্থ রাখে না । তারপর জিবরাঈল (আঃ) চতুর্থ বার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত সাত হারফে কুরআন পাঠ করবে এবং এর যে কোন হারফ ও ধরন অনুসারে তারা পাঠ করলে তা-ই যথার্থ হবে। [৭]

Scanned by CamScanner

৪ এক: কুরআন যদি সাত হারফেই হয়ে থাকে তাহলে লাওহে মাহফুজে কোন হারফের কুরআন সংরক্ষিত আছে?

⌑ উত্তরঃ এর জবাব হাদিসেই আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জিবরাঈল (আ) আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের সুবিধার জন্যে জিবরাঈল(আ) এর কাছে অন্যান্য হারফে শিখাতে অনুরোধ করেছেন তারপর জিবরাঈল(আ) সাত হারফে কুরআন শেখান।

কুরআন প্রথমে যেভাবে নাযিল হয়েছিলো সেই কুরআনই লাওহে মাহফুজে সংরক্ষন করা আছে। আল্লাহু আ'লাম।

৪ দুই: কুরআন সংরক্ষনের দায়িত্ব তো আল্লাহই নিয়েছেন তাহলে এই কুরআন নিয়ে এত মতপার্থক্য কেন হবে?

⌑ উত্তরঃ এগুলো মোটেই কোনো মতপার্থক্য নয়। এতে কুরআনের চিরন্তন সত্যে একটুও ফাটল ধরছে না। আর পূর্বেই পরিষ্কার করা হয়েছে যে এই 'মতপার্থক্যে'র ধরন কেমন।

উপরে আল কুরআনের ৭টি হারফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক সময়েই খ্রিষ্টান প্রচারক কিংবা নাস্তিকরা বিভিন্ন প্রাচীন কুরআনের আংশিক অংশ (fragment) দেখিয়ে দাবি করতে চান যে - এগুলোতে সামান্য শব্দ ও বাক্যের পার্থক্য প্রমাণ করে যে আল কুরআন নাকি বিকৃত হয়ে গেছে!! উপরের আলোচনা দ্বারা তাদের অপযুক্তির অপমৃত্যু হল। যেসব খ্রিষ্টান প্রচারক এইসব ভিন্ন হারফ কিংবা কিরাত দেখিয়ে দেখিয়ে দাবি করতে চায় যে "কুরআনের ভিন্ন ভার্সন আছে", তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলবো আল কুরআনের ভিন্ন হারফগুলো আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ্(صلى الله عليه وسلم) কর্তৃক অনুমোদিত। আপনাদের বাইবেলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে যে হাজার হাজার ভিন্নতা আছে, এগুলোর অনুমোদন কে করেছে? এগুলোর মধ্যে কোনটা 'আসল' বাইবেল? কোন পাণ্ডুলিপিটা যিশু বা তাঁর সহচররা অনুমোদন করেছেন বা পড়েছেন? এতক্ষন বললাম বাইবেলের নতুন নিয়মের (New Testament) তথাকথিত "মূল" কপির ব্যাপারে যেগুলো গ্রীক ভাষায় লেখা অথচ যিশু [ঈসা(আ.)] মোটেও গ্রীকভাষী ছিলেন না। খ্রিষ্টানদের কিতাবের তথাকথিত "মূল কপি" গুলোও যিশু খ্রিষ্টের নিজ ভাষায় নেই। অনুবাদের হাজার হাজার জালিয়াতী, হাজার হাজার ভিন্ন ভার্সন, একেক খ্রিষ্টান দলের একেক রকমের বাইবেল

Scanned by CamScanner

এগুলোর কথা তো আলোচনাতেই আনিনি। যাদের নিজেদের কিতাবের অবস্থা এই, তারা কোন মুখে মুসলিমদের কিতাবের সমালোচনা করতে আসে?

আবার তাকান হিন্দুদের রামায়ণ গ্রন্থের দিকে। এই রামায়ণের ৩০০ এর মত ভার্সন আছে। হ্যাঁ ভার্সন। একেকজনে একেক ভাষায় রামায়ণ লিখতে যেয়ে আকাশ পাতাল পরিবর্তন করে ফেলেছে। সংস্কৃত রামায়ণে রাম যেখানে 'পুরুযোত্তাম' বা একজন আদর্শ পুরুষ, সেখানে অন্যান্য রামায়ণে সেই রাম হয়ে গেলো বিষ্ণু অবতার! কোনো ভার্সনে সীতা অপহৃত হয়, কোথাও হয় না; কোথাও সীতার জন্মকাহিনী একরকম কোথাও আবার আরেকরকম! কোথাও আবার সে স্বয়ং রাবণেরই মেয়ে! কোথাও রাবণকে ভালো গুণের আধার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে আবার কোথাও বা সে রাক্ষসরাজ! কোথাও লক্ষ্মণ রেখা ছাড়া রামায়ণ পূর্ণ হয়না আবার কোথাও কোথাও এর টিকিটা পর্যন্তও খুঁজে পাওয়া যায়না। কোথাও হনুমান বানর আবার কোথাও হনুমান বনে বসবাস কারী এক প্রজাতির প্রাণী। কেউ আগ্রহী হলে Many Rāmāyanas, The Diversity of a Narrative Tradition in South Asia বইটি এবং এ.কে. রামানুজানের Three Hundred Rāmāyanas: Five Examples and Three Thoughts on Translation প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন।[1]

পরিশেষে বলব, কিরাতের কিংবা আহরুফের পার্থক্যের কারণে কুরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা অজ্ঞতা ও বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। বরং তখন থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন টিকে আছে কোটি কোটি হাফেজের মাধ্যমে, যাঁরা টেকে বুকে ধারণ করেন। যাঁরা আজও জমীনের বুকে হাঁটেন। যাঁদের মধ্যে আরবীর প্রাথমিক জ্ঞানও নেই এমন অনেকে আছেন। তবুও তাঁরা সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষার একটি বইয়ের আগাগোঁড়া মুখস্থ করে রেখেছেন ও যুগ পরম্পরায় এটি একমাত্র এবং একমাত্র কুরআনেরই মুজিজা বা অলৌকিকতা। যার সামান্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত আর কোনো বই এই ধরণীর বুকে পাওয়া যাবে না। নিদর্শন তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেই তবে নেওয়ার মত কেউ কি আছে?

---

[1] রামায়ন হিন্দুদের মূল রেফারেন্স গ্রন্থ নয়, কিন্তু যেহেতু সাধারণভাবে এটাই বেশি ব্যবহৃত হয় তাই এর উদাহরণই দেওয়া হলো। - সম্পাদক

Scanned by CamScanner

তথ্যসূত্রঃ

[১] Arabic-English Dictionary for Quranic Usage, p 201; কুরআনের অর্থ বুঝার সহজ অভিধান, আবদুল হালীম, পৃ-৬৫ (IslamHouse.com.bd)

[২] সহীহ বুখারী,(ইফা), ফাযায়িলুল কুরআন, ৮/৩৪০, হা-৪৬২৫

[৩] https://islamqa.info/ar/5142

[৪] মাওলানা তাকী উসমানী, উলূমুল কুরআন ও উসূলে তাফসীর, পৃ-৯৬

[৫] সহীহ বুখারী, ফাযায়িলুল কুরআন

[৬] সহীহ মুসলিম,(ইফা), ৩/১৬৭, হা-১৭৮১

[৭] ঐ, হা-১৭৮৩

Scanned by CamScanner

منارة

Scanned by CamScanner

১৩তম অধ্যায়

মুসলিমরা দলে দলে বিভক্ত, তাহলে ইসলাম কীভাবে সত্য ধর্ম হয়?

তানবীর হাসান বিন আব্দুর রফীক

Scanned by CamScanner

প্রশ্নঃ মুসলিমরা দলে দলে বিভক্ত। তারা দলে দলে বিভক্ত হবে এটা নাকি নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই বলে গেছেন। তাহলে ইসলাম আবার কীভাবে সত্য ধর্ম হয়, যেই ধর্মের অনুসারীরা দলে দলে বিভক্ত?

উত্তরঃ কোনো একটা বিষয়ে একাধিক দল বা মত তৈরি হওয়াই এটা বুঝায় না যে, সে বিষয়টা ভুল। বড় বড় বিজ্ঞানীদের মাঝেও মতভেদ হয়, মতভেদ হয় ডাক্তারদের মাঝেও এমনকি বুদ্ধিজীবিদের মাঝেও মতভেদ দেখা যায়। ধরুন এক ডাক্তার আপনাকে মাথা ব্যথার একটা ট্যাবলেট খেতে দিলো। অন্য ডাক্তার ভিন্ন নামের এক ট্যাবলেট খেতে দিলো। আরেকজন ডাক্তার আরেকটা ট্যাবলেট খেতে দিলো। সবশেষে এক গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারও মাথা ব্যথার এক ট্যাবলেট ধরিয়ে দিলো।

দেখা গেলো, প্রথম তিন ডাক্তারের ট্যাবলেট খেয়েই মাথা ব্যাথা সেরে যাচ্ছে। কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারের ট্যাবলেটে কিছু তো হলোই না মাথা ব্যাথা গেল আরো বেড়ে! এর পিছনে হেতুটা কী?

মূল ব্যাপার হচ্ছে, প্রথম তিনজন ডাক্তার ভিন্ন নামের ঔষধ দিলেও, সেসব ঔষধের উপাদান ছিলো এক। কেবল একেক ঔষধ একেক কোম্পানী বানিয়েছে। তাই সেগুলোর নামও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারের ঔষধ ছিল তার মনগড়া। প্রথম তিনজন তিন নামের ঔষধ দিয়েও সঠিক পথেই আছে। কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তার আছে ভুল পথে। এমন হাতুড়ে ডাক্তার সংখ্যায় হাজার হাজারও হতে পারে, তবুও ডাক্তার ও ঔষধের অবদান অস্বীকার করা যায় না। সমাজে ভুয়া ডাক্তার আছে বলে ঔষধ বলেই কিছু নেই, এমন উদ্ভট তথ্য তো আর সামনে আনা যায় না।

এবার আরেক উদাহারণ দেই; এক পথচারী বলল, আমি বরিশাল যেতে চাই, পথটা দেখাবেন? একজন বলল, সায়েদাবাদ থেকে বরিশালের বাস পাবেন। আরেকজন বলল, সদরঘাট থেকে বরিশালের লঞ্চে উঠবেন। আরেকজন তাকে বলল, কমলাপুর

Scanned by CamScanner

থেকে বরিশালের ট্রেন পাওয়া যায়।

যাদের বাড়ি বরিশালে, তারা হয়তোবা এতক্ষণে হেসেই দিয়েছেন। কারণ তারা জানেন কমলাপুর থেকে বরিশালের কোনো ট্রেন ছেড়ে যায় না। বাসে কিংবা লঞ্চে বরিশাল যেতে পারবেন। তবে কমলাপুরের ট্রেন ধরলে হয়তো থাকবেন গাজীপুরে , কিংবা যাবেন চিটাগাংয়ে, কিন্তু বরিশাল আর যাওয়া হবে না। এখন কি কেউ বলবেন, বরিশাল নামে কোনো জেলাই নেই? কমলাপুর থেকে যাওয়া যায় না বলে বাসে আর লঞ্চে যাওয়ার বিষয়টাও ভুয়া- এমন কথাও কি শুনতে হবে?

ইসলামের ব্যাপারটিও ঠিক একই রকম । ইসলামের নামে কেউ দলে দলে ভাগ হলেই ইসলামও ভুল, সমীকরণ এতো সরল নয়। আবার এতো সবের মাঝে কোনো দলই হকের উপর টিকে নেই এমনও নয়। নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামে যে হাদীসটি মুসলিমদের দলে দলে ভাগ হওয়ার বিষয়ে বলা হয় সেটি হচ্ছে,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بني إسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بني إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

নিঃসন্দেহে আমার উম্মাত সে পর্যায়ে পতিত হবেই, যে পর্যায়ে পতিত হয়েছিল বনী ইসরাইলরা। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজের মায়ের সাথে যেনা করে, আমার উম্মাতও এমনটাই করবে। আর বনী ইসরাইলরা পৃথক হয়েছিল ৭২ দলে। আর আমার উম্মাত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে, শুধু একটি দল ছাড়া। তাঁরা (সাহাবাগণ) বলল, হে আল্লাহর রসূল তাঁরা কারা? তিনি বললেন, যার উপর আমি ও আমার সাহাবীরা (সঙ্গী-সাথীরা) আছি (এর উপর যারা থাকবে)।[১]

সাহাবীরা যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ (ইখতিলাফ) করে থাকেন, তাহলে সেসব বিষয়ে মতভেদ যথোচিত। আর যেসব বিষয়ে তাঁরা মতবিরোধে (ইখতিলাফ) জড়াননি বরং তাঁদের থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে সেসব বিষয়ে মতবিরোধ অন্যায্য। সাহাবীরা দীনের শাখাগত (ফুরুয়ী মাসয়ালা) বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। তবে দীনের মৌলিক (আছল) বিষয়ে তাঁরা কোনো মতভেদ করেননি। তাই মতভেদ মানেই দলভেদ নয়। এখানে ফিরকা বা দলে দলে ভাগ হওয়ার মানদন্ড হচ্ছে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবী বা সঙ্গী-সাথীদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। মতভেদের

Scanned by CamScanner

পরও কেউ জান্নাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যদি তাঁর মতভেদ এমন বিষয়ে হয় যা সাহাবী যামানায় ছিলো অর্থাৎ, শাখাগত বিষয়ে মোটা দাগে ও সুস্পষ্ট বিষয়ে নয়।।

যেমন এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইমাম মানাবী (৯৫২-১০৩১ হিজরী) রহিমাহুল্লাহ বলেন,

هذا الاختلاف في الأصول وأما اختلاف الرحمة فهو في الفروع واختلف العلماء

এই (জাহান্নামপ্রাপ্ত দলগুলোর) মতভেদ হচ্ছে মৌলিক বিষয়ের মতভেদ, আর সেই মতভেদ তো রহমতস্বরূপ যে মতভেদ আলিমগণ শাখাগত বিষয়ে করেছেন।[২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা আলিম আল্লামা উবাইদুল্লাহ আর-রহমানী মুবারকপুরী (১৩২৭-১৪১৪ হি) রহিমাহুল্লাহ আরো সুন্দর ভাষায় বলেছেন,

وليس المراد بالافتراق في الحديث مطلق الافتراق حتى يدخل فيه ما وقع من الاختلاف في مسائل الفروع في زمان الخلفاء الراشدين، ثم في سائر الصحابة، ثم في التابعين، ثم في الأئمة المجتهدين، بل المراد به الافتراق المقيد

আর এই হাদীসে মতবিভক্তি দ্বারা সকল সাধারণ মতবিভক্তি উদ্দেশ্য নয়; তাই খুলাফায়ে রাশিদীনের[৩] *যুগে শাখাগত মাসয়ালায় যে মতভেদ হয়েছিলো তা এর আওতায় পড়বে না, অনুরূপ তাও এর আওতাভুক্ত হবে না যা সাহাবীদের মাঝে চলমান ছিল, তাবিয়ীনদের (সাহাবীদের সঙ্গী-সাথী) মাঝে যে মতভেদ হয়েছিলো তাও এর অন্তর্ভূক্ত হবে না এবং অন্তর্ভূক্ত হবে না তাও যা ঘটেছে মুজতাহিদ ইমামদের*[৪] *মাঝে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট বিভক্তি।*[৫]

একই ধরণের কথা আরো বহু কিতাবে এসেছে।[৬]

সাহাবীদের যুগে অসংখ্য বিষয়ে মতভেদ হয়েছে। এর নজির হিসেবে আমরা নিম্নের হাদীসটি দেখতে পারি। প্রখ্যাত সাহাবী ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহযাব থেকে ফিরে আসলেন তখন আমাদেরকে বললেন,

«لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

"তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযাতে না পৌঁছা পর্যন্ত আসরের সলাত না পড়ে।" অতঃপর তাঁদের কারো কারো রাস্তাতেই আসরের সময় হয়ে

Scanned by CamScanner

গেল। তাই তাঁদের কেউ কেউ বলল, "আমরা সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত সলাত পড়ব না।" আর তাদের কেউ কেউ বলল, "আমরা বরং সলাত পড়ে নিব, তিনি আমাদেরকে অমনটা বুঝাননি (যে সেখানে না পৌঁছাতে পারলে সলাত পড়ব না)।" অতঃপর তাঁরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলো। কিন্তু তিনি তাঁদের কারো সমালোচনাই করলেন না। [৭]

এভাবে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যেখানে দেখা যায় সাহাবীরা বহুতরফা মতভেদ করেছেন। এবার আসুন শুরুর দৃষ্টান্তগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখি; আমরা দেখলাম ডাক্তারদের মধ্যে মতবিরোধ হয়, পথনির্দেশকারীদের ভিতরেও মতভেদ হয়, একইভাবে মুসলিমদের মাঝেও বহুতরফা মতভেদ হতে পারে। আমরা দেখলাম যদি ঔষধের উপাদান ঠিক থাকে, তাহলে যে কোম্পানীর ঔষধই দেয়া হোক না কেন তা সঠিক; রাস্তা যদি গন্তব্য পানে হয় তাহলে যে বাস আর লঞ্চ দিয়েই যাওয়া হোক না কেন তা নির্ভুল; একইভাবে কারো কথা, কাজ ও বিশ্বাস যদি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা যার উপর ছিলেন সে অনুপাতে হয় তাহলে এখানে নানা তরফা মত দেয়া হলেও কোনোটিই ভুল নয়।

এখানে ভিত্তি হচ্ছে ঔষধের উপাদান ঠিক থাকা, রাস্তা গন্তব্য পানে হওয়া এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা যার উপরে ছিলেন তাঁর উপরে থাকা। তাই উপাদান ঠিক না রেখে যত ঔষধই বানানো হোক, গন্তব্যে পানে পথ না ধরে যে কোনো দিকেই যাওয়া হোক, আর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা যার উপরে ছিলেন তা বাদ দিয়ে যত বিষয়ই আকড়ে ধরা হোক; তার সব কিছুই বাতিল। এসব বাতিল কোটি কোটি থাকলেও যেমন ওষুধ আর ডাক্তারের অবদান অস্বীকার করা যায় না এবং বাস-লঞ্চ সব ভুয়া আর বরিশাল নামে কোনো জেলাই নেই বলা যায় না, ঠিক তেমনি ইসলামের নামে তৈরি হওয়া বাতিল অনুসারীদের কারণে ইসলামকেও অস্বীকার করা যায় না আর সত্যিকারের অনুসারীদেরকেও তুচ্ছজ্ঞান করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহলে এ কথা বলল কেন? তিনি কি এ কথা বলে প্রকারান্তরে দলাদলিকে উৎসাহিত করলেন না?

উত্তর হচ্ছে, না। কারণ তিনি এখানে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে পাওয়া তথ্যই উম্মাতকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সাবধান করে গেছেন, যেন আমরা দলে দলে বিভক্ত না হই।

Scanned by CamScanner

ধরুন, একটি সংগঠন বানানো হলো। অবস্থাদৃষ্টে সংগঠনের সভাপতি বললেন, "আমার মনে হচ্ছে অচিরেই এ দলে ভাঙন আসবে। বহুরুপী নামধারী কর্মীরও উদ্ভব হবে। আমি সাবধান করে যাচ্ছি। আর বলে যাচ্ছি, এসব নামধারী ভুয়া কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।"

এখন এই সভাপতির ক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন? এতে করে কি তিনি সংগঠন ভাঙনে উৎসাহ দিয়েছেন? এটা বরং সভাপতির দূরদর্শিতার প্রমাণ। তাই যদি হয়, তাহলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বাণীতে আপনি খুঁত খুঁজে পান কীভাবে? এতে কি তিনি দলাদলিতে প্রেরণা যুগিয়েছেন বলে মনে হয়? উপরন্তু কোথায় সেই সভাপতি আর কোথায় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা তাঁকে আল্লাহ প্রেরিত নবী ও রসূল বলে বিশ্বাস করি। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত সূত্রে আমাদেরকে এ জাতীয় তথ্য জানাতেই পারেন।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) অনেকের কথা মতো যদি এমনই হতো যে, নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য নবী নন, তাহলে তিনি নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অনুসারীদের আরো খুশি রাখতে দলাদলির কথা না বলে উল্টো তারা আরো একত্রিত থাকবে বলেই ঘোষণা দিতে পারতেন। যেখানে তিনি বনী ইসরাইল অর্থাৎ, ইহুদীরা ৭২ দলে ভাগ হয়েছে বলে জানিয়েই দিলেন সেখানে তিনি মুসলিমদের খুশি রাখতে তারা একত্রিত থাকবে বলেই ঘোষণা দিলে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে আরো এক দলের কথা বাড়িয়ে বললেন! তিনি বললেন, "আমার উম্মাত ভাগ হবে ৭৩ দলে!"

কারণ তিনি এ কথা নিজ থেকে বানিয়ে বলেননি। মহান আল্লাহ কুরআনে বলেই দিয়েছেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى • إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

আর তিনি নিজ খেয়ালখুশি থেকে কিছুই বলেন না। তাতো কেবল ওহী ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়, যা তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়।[৮]

উপরন্তু উক্ত হাদীসের শেষেই কিন্তু নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন কীসের উপর থাকলে সেই জান্নাতের পথিক হওয়া যাবে,

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

যার উপর আমি ও আমার সঙ্গী-সাথীরা আছি।

Scanned by CamScanner

কুরআনের অগণিত আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসে বাঁচার এভাবে পথ বলেই দেয়া হয়েছে;

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

আর তোমরা একত্রিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআন ও সুন্নাহ) মজবুত করে আকড়ে ধরো, আর দলে দলে বিভক্ত হয়ো না।[৯]

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; এ দুটি জিনিস আকড়ে ধরলে তোমরা কখনোই পথচ্যুত হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব অপরটি নবীর সুন্নাহ।[১০]

অপর হাদীসে বলা হয়েছে,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

তোমাদের মধ্য হতে কেউ আমার পর বেঁচে থাকলে, সে অসংখ্য মতভেদ দেখতে পাবে। তাই তোমরা আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো এবং সত্যনিষ্ঠ হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের (খুলাফায়ে রাশিদীন) সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো। আর এই সুন্নাহ আকড়ে ধরো তোমাদের মাড়ির দাত দিয়ে।[১১]

কুরআনের বহু আয়াতে দলাদলিকে জোরালো ভাষায় নিন্দনীয় হিসেবেই ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেছেন,

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

অতঃপর তারা তাদের (দীনের) নির্দেশনাকে নিজেদের মধ্যে বহু টুকরোয় ভাগ করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা রয়েছে তা নিয়ে আনন্দিত।[১২]

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ

Scanned by CamScanner

আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না। করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে। আর সবর করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন।[১৩]

মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে অন্য আয়াতে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে বহু ভাগে ভাগ ভাগ করে নিয়েছে এবং নিজেরা বিবিধ দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, (হে মুহাম্মাদ) তাদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর কাছেই ন্যস্ত। এরপর তিনি তাদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তারা করতো।[১৪]

কত স্পষ্টরূপে আল্লাহ নিজের নবীকেই জানিয়ে দিলেন যে, তাদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই। অনেকে এ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, আল্লাহ তো চাইলে এ বিভ্রান্তির পথ বন্ধ করে মুসলিমদের দলাদলি হতে বাঁচাতে পারতেন। এ কথা সত্য যে, আল্লাহ না চাইলে কেউই সরল পথ হতে বিচ্যুত হতো না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ

যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাঁরা এ কাজ করতে পারতো না।[১৫]

কিন্তু দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার ময়দান। আল্লাহ চেয়েছেন বান্দাদের পরীক্ষা করতে। তিনি চেয়েছেন হক ও বাতিল উভয়ই থাকবে। যে যে পথে চলতে চায় চলবে। সবশেষে পরকালে তার ফয়সালা হবে। তিনি তো বলেই দিয়েছেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

তিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যেন পরীক্ষা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে (আমল) সবচেয়ে সুন্দর।[১৬]

বাতিল বলতে যদি কিছু নাই থাকতো তাহলে কুরআন-সুন্নাহ বা ওহীর বিধান দেওয়ারও কোনো প্রয়োজন পড়তো না, আর না নবী-রসূল প্রেরণের কোনো জরুরৎ ছিল। আল্লাহ বলেছেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Scanned by CamScanner

অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হিদায়াত (পথনির্দেশিকা) আসবে তখন যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাঁদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তিতও হবে না।[১৭]

তিনি আরো বলেছেন,

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

রসূলগণকে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, যেন রসূলগণ চলে আসার পর আল্লাহর সামনে মানুষের অজুহাত পেশ করার মতো কিছু না থাকে।[১৮]

মহান আল্লাহ যেমন হক ও বাতিলের পথ খোলা রেখেছেন, ঠিক তেমনি হক-বাতিলের পথ বাতলেও দিয়েছেন। তিনি যেমন মুসলিম হয়ে ঈমানের পথ ধরার সুযোগ রেখেছেন, ঠিক তেমনি কাফির হয়ে কুফরির পথ অবলম্বনেরও সুযোগ দিয়েছেন। ঈমান ও কুফর একজন বান্দার জন্য পরীক্ষা। একইরূপে ইসলামের ভিতরেও মুসলিম পরিচয়ে যে কেউ পথবিচ্যুত হতেই পারে; এটিও বান্দার জন্য পরীক্ষা। কুরআন-সুন্নাহ না মেনে কেউ বিভ্রান্ত যেমন হতে পারে ঠিক তেমনি কুরআন-সুন্নাহ মানার নাম করে খেয়ালখুশি মাফিক চলতে গিয়েও কেউ পথ হারাতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন।

(আল্লাহু আ'লাম) আল্লাহই সব কিছু সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

Scanned by CamScanner

তথ্যসূত্রঃ

[১] তিরমিযী, মুহাম্মাদ বিন ঈসা, ২৬৪১; আল-মুসতাদরাকু লিল-হাকিম, আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, ৪৪৪; মিশকাতুল মাসাবীহ, আবূ আব্দুল্লাহ আত-তিবরীযী, ১৭১; হাদীসটিকে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাসান বলেছেন।

[২] ফাইযুল কাদীর, মানাবী, ৫/৩৪৬

[৩] খুলাফায়ে রাশিদীন অর্থঃ সত্যনিষ্ঠ খলীফাগণ। যেসব সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর অবর্তমানে তাঁরই আদলে ইসলামী খিলাফতব্যবস্থার মূল কর্ণধার ছিলেন তাঁরাই খুলাফায়ে রাশিদীন। তাঁদের মধ্যে আছেনঃ আবূ বকর, উমার, উসমান ও আলী রদিয়াল্লাহু আনহুম। কেউ হাসান রদিয়াল্লাহু আনহুকেও এর মাঝে অন্তর্ভূক্ত করেন। [আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইবনু কাছীর, ৮/১৬]

[৪] মুজতাহিদ ইমাম হচ্ছেন ঐসব বিজ্ঞ গবেষকগণ যারা নির্দিষ্ট নিয়মনীতির আলোকে কুরআন ও হাদীস হতে শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম ব্যাখ্যা করেন। [আল-কুল্লিয়াত, আবূল বাক্কা, ১/৪৪]

[৫] মিরআ'তুল মাফাতীহ, উবাইদুল্লাহ আর-রহমানী, ১/২৭০

[৬] আওনুল মা'বুদ ওয়া হাশিয়াতু ইবনুল কয়্যিম, আল-আযীম আবাদী, ১২/১২২; তুহফাতুল আহওয়াযী, আব্দুর রহমান আল-মুবারকপুরী, ৭/৩৩২

[৭] বুখারী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, ৯৪৬, ৪১১৯; মুসলিম, মুসলিম বিন হাজ্জাজ, ১৭৭০; শারহুস সুন্নাহ, আবূ মুহাম্মাদ আল-বাগাবী, ৩৭৯৮

[৮] সুরাতুন নাজমঃ ৩-৪

[৯] সূরা আলে ইমরানঃ ১০৩

[১০] তাফসীরু ইবনু কাছীর (সালামাহ), ইবনু কাছীর, ৭/২০৩; মুয়াত্তায়ু মালিক (আ'যামী), মালিক বিন আনাস, ৩৩৩৮; আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী, আবূ বাক্‌র আল-বাইহাকী, ২০৩৩৬; শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১১] মুসনাদু আহমাদ, আহমাদ বিন হাম্বাল, ১৭১৪৪, ১৭১৪৫; দারিমী, আবূ মুহাম্মাদ আদ-দারিমী, ৯৬; ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ, ৪২; আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআছ, ৪৬০৭; হাদীসটিকে শাইখ আরনাউত ও শাইখ আলবানী রহিমাহুমাল্লাহ সহীহ বলেছেন।

[১২] সূরাতুল মু'মিনুনঃ ৫৩

[১৩] সূরাতুল আনফালঃ ৪৬

[১৪] সূরাতুল আন'আমঃ ১৫৯

[১৫] সূরাতুল আন'আমঃ ১১২

[১৬] সূরাতুল মুলকঃ ২

[১৭] সূরাতুল বাক্বারাহঃ ৩৮

[১৮] সূরাতুন নিসাঃ ১৬৫

Scanned by CamScanner

১৪তম অধ্যায়

ফিরে তাকাও...

মাহফুজ আলামিন

Scanned by CamScanner

আমি বলছিনা তোমাকে সমাজ নিয়ে ভাবতে হবে। সমাজের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে অগ্রসর হতে হবে, কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে। আমি তোমাকে এতোখানি কষ্ট করতে বলছিনা! আমি তোমাকে রাষ্ট্রনীতি নিয়েও মাথা ঘামাতে বলছি না। রাষ্ট্রব্যবস্থা ঠিক কোন নীতিতে চললে রাষ্ট্রের জনগণ সুখে, শান্তিতে, নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারবে তা নিয়ে তুমি বিচলিত হয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলো সে বোঝাও আমি তোমার উপর চাপাতে চাচ্ছিনা।

তোমাকে বলছিনা সব বিষয়ে হালকার উপর ঝাপসা ধারণা নিয়ে সবজান্তা শমসের হয়ে যেতে কিংবা তোমার চারপাশের মানুষগুলোর উপকারে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। আমি তোমাকে এও বলছিনা নিজের পরিবার, আত্মীয়স্বজনদের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে, নিজের সুখ, দুঃখের কথা ভুলে অপরের তরে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে! তাহলে আমি তোমাকে আসলে কী বলতে চাচ্ছি? আমি কেবল তোমাকে এইটুকুই বলতে চাচ্ছি, তুমি সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, চারপাশ নিয়ে ভাবো আর নাইবা ভাবো অন্তত নিজেকে নিয়ে একটিবার সত্যিকার অর্থে ভাবো তো! না আমি তোমাকে আত্মকেন্দ্রিক হতে বলছিনা, বলছিনা স্বার্থপর হতে।

আমি বলছি, এই দুনিয়ায় চোখ মেলার পর থেকে আজ অবধি যেই "মাই লাইফ মাই রুলের" স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে আসছো তার বাস্তব প্রতিফলন এর দিকে তাকাতে। মনের কু প্রবৃত্তির পূজা করে, সমাজের শেখানো ভালো মন্দের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নিজেকে জাতে তুলতে, ট্রেন্ড এর অনুকরণ করতে গিয়ে নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে তুমি যে ভেতরে ভেতরে কি পরিমাণ হাঁপিয়ে উঠেছো সেটা কি একটিবারও লক্ষ্য করেছো তুমি? এই সত্যটা কি স্বীকার করতে মনে চায়না? একটিবারের জন্যও না? তোমার আত্মার গভীরে জীবনের উদ্দেশ্যহীনতার যে শূণ্যতা, হাহাকারের কালো মেঘ জমে আছে তা কি তুমি বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে দিতে চাওনা? চাওনা কি সুড়ঙ্গের

Scanned by CamScanner

তুমিই আমায় বল! তোমার নাটক, সিনেমা, পার্টি, হ্যাংআউট, স্মার্টনেসের পেছনে অবিরাম ছুটে চলা, প্রেয়সীর হাত ধরা, বিদিষার চুলে আলতো ছোঁয়া, হতাশার তোড়ে তোমার ভিতরে টেনে নেওয়া ড্রাগ- এগুলো তোমাকে আসলে কি দিয়েছে? দিতে পেরেছে শান্তি? হ্যাঁ, বলবে তোমার তো ভালো লাগতো। হ্যাঁ আমিও বলি ভালো লাগতো। কিন্তু সেই ভালো লাগা কি আসলেই শান্তি? তুমি কি শান্তির সংজ্ঞা জানো? মনে হয় জানো না। আচ্ছা, তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে এসব তোমাকে শান্তির বদলে ভেতরে ভেতরে পুড়িয়ে ঝলসে করে দেয়নি? তুমি তো না বুঝেই শান্তির পিছনে ছুটেছো, তোমার মনের বাসনা পূরণ করেছ, কিন্তু তোমার অন্তর কি শান্ত হয়েছে? তোমাকে দেখে তো তা মোটেই মনে হয় না। কিন্তু তুমি যতই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াও, অহংকারী সত্তাটাকে সর্বেসর্বা ভাবতে চাও, তোমার ভেতরের কিছু একটা যে তোমাকে বারবার ফিরে আসতে আকুতি জানিয়েছে তা কি তুমি মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবে?

তুমি কি পেরেছ, মন যা খুশি তাই করে আত্মায় পবিত্র শান্তির ছোঁয়া দিতে? পেরেছো কি, সমাজ, ট্রেন্ড এর অনুগত দাস হয়ে নিজের মন কে তৃপ্ত করতে? নিজের বাসনার পারদ আর কত উপরে উঠলে পরে তুমি শান্ত হবে? খাহেশাত তো অনেক দাপিয়ে বেড়িয়েছে কিন্তু থেমেছে কি তোমার ভেতরের ছটফট করা প্রবণতা? পেরেছ কি ধর্ম যার যার উৎসব সবার নামক আদর্শহীন এক অমেরুদণ্ডী প্রাণি হয়ে সবার চোখে ভালো সাজতে?

কই পারলে তুমি, কই? প্রতিটা সেকেন্ড তুমি মিথ্যে প্রলোভন এর আগুনে জ্বলছো, প্রতিটা মুহূর্ত তুমি ভোগবাদী প্রবণতার বাই প্রোডাক্ট হতাশায় পুড়ছো, নিজের অজ্ঞতার অহংকারের নেশায় ডুবে মরছো! তুমি ভালো করেই জানো, তুমি নিজের সাথে আত্মপ্রতারণা করছো! তোমার ভেতরের ছটফটে সত্তাটাকে আর কত এড়িয়ে যাবে বলো? নিজের কাছ থেকে নিজেকে আর কত পালিয়ে বেড়াবে?

আচ্ছা, তুমি কখনো এমন অসুস্থ হয়েছ যে মনে হয়েছে আর যেন বাঁচবো না? জানো আমি হয়েছি বা আমার এরকম অনুভূতি হয়েছে। আমার বারবার মনে হয়েছে এই এত চনমনে ভার্সিটির দিনগুলো, এত এত আড্ডা-বন্ধু-মৌজ-মাস্তি এক্ষুণি যদি শেষ হয়ে যায়? কেন শেষ হবে? আমি কি এগুলো শেষ করতে চেয়েছি? তবে শেষ কেন হবে? কিন্তু তুমি যাও কোনো কবরস্থানে দেখবে এরকম অসংখ্য লোক চিরনিদ্রায় শায়িত যারা তাদের সাজানো গোছানো জীবনটাকে হুটহাট করে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সেই

Scanned by CamScanner

অন্ধকার কবরে। কত জনকে দেখবে যে মাথা উঁচু করা ইমারত বানাচ্ছিলো যে একটু আরামসে শেষ জীবনটা কাটাবে, ইমারত তার মাথা টান করে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে শুধু অতবড় জায়গাটাতে সেই আংকেলের জায়গা হলো না, কেননা তিনি আর বর্তমান নেই, তিনি পা রেখেছেন আরেক জীবনে; কিংবা ভাবো সেই ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেটার কথা, যে কিনা বান্ধবী আর বন্ধুদের সাথে গিয়েছিলো নদীতে নৌকা ভ্রমণে, সে বাসায় ফিরেছিলো; কিন্তু প্রাণহীন লাশ হয়ে, হাত-পা-মুখ-চোখ সব আগের মতই কিন্তু শুধু রুহটাই নেই। চারপাশে অসংখ্য অসংখ্য মৃত্যুর খবর আর মাইকিং আমাদের উপলব্ধি করায় না যে আমরা প্রত্যেকে একা, প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ, পৃথিবী থাকার জায়গা না। এত এত উদাহরণগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় না যে আমরা এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এসেছিলাম, আর জীবনে সেই উদ্দেশ্যের খোঁজ করা আর সেই উদ্দেশ্য মোতাবেক জীবন পরিচালনাই সবচেয়ে বড় সত্য। কেননা জীবন একটাই, এখানে পাশার চাল একবারই দেওয়া যায়, একবার মিস তো সবকিছু শেষ। আর কত নিজের জীবনের মত এরকম একটা ক্রুশাল জিনিসকে এতটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে?

ভালো করেই জানো তুমি সাজানো গোছানো এক আত্মপ্রতারণার জগতে বাস করছো তুমি! একটুও ভালো নেই তুমি, একটুও না! তোমার দেহ, রূপ, টাকা, ক্ষণিক দুধের মাছি, প্রভাব, ক্ষমতা কোন কিছুই তোমার ভেতরের শূণ্যতাকে মেটাতে পারেনি। বরং বাড়িয়েই চলেছে, বাড়িয়েই চলেছে!

আমি জানি তুমি আর তোমরা ক্লান্ত। অনেক ক্লান্ত, নিদারুণ শ্রান্ত, ভালো থাকার অভিনয়ে বিরক্ত, অত্যন্ত অশান্ত, একেবারে অসহায়, হাত তোমার শূণ্য, অন্তরের অনুভূতিগুলো তিক্ত। আমি জানি তুমি আর তোমরা ভালো নেই, ভালো নেই তোমরা নফসের খাহেশাত পূরণের ম্যারাথন দৌড় দিতে দিতে, লৌকিকতার বোঝ উঠাতে উঠাতে, এই যান্ত্রিকতার জীবনের ভার উত্তোলনে, সন্দেহবাদীতার মরীচিকার পিছনে না বুঝে দৌড়াতে দৌড়াতে, না পাওয়া নিয়ে আফসোস করতে করতে, ছায়ার মত দুনিয়ার জীবনের চোরাবালিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে থাকতে। অনেক তো হলো এবার একটু থামো! এবার নাহয় একটু রুখে দাঁড়াও! খোদ সত্তাটার দিকে করুণার নজরে হলেও একটিবার ফিরে তাকাও; নিজের মিথ্যে আমিত্ব, মিথ্যে প্রলোভন, প্রবৃত্তির গোলামীকে বিসর্জন দিয়ে নিজের ভেতরের মৃতপ্রায় ফিতরাহকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলো; সেই সত্ত্বার দিকে মনোযোগী হও যিনি ওই আসমান আর জমিন সৃষ্টি করেছেন। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতি মূহুর্তে তোমার প্রয়োজন পূরণ করে যাচ্ছেন, যিনি তোমার প্রতিটি ডি.এন.এ (D.N.A) কে সাজিয়েছেন এতো সুন্দর গঠনে; তোমার দৃষ্টিশক্তির তীব্রতা, তোমার মস্তিষ্কের ক্ষীপ্রতা, তোমার বাহুবল,

Scanned by CamScanner

সবই তাঁর দান। তাঁর কাছে সময় থাকতে প্রত্যাবর্তন করো, সাহস করে তাঁর কাছে নিজেকে একটিবার সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল (ভরসা) নিয়ে সঁপে দাও, দিয়েই দেখো না কি আলোকময়, শান্তিময়, ভালোবাসাময় এক প্রশান্ত হৃদয় তিনি তোমাকে দান করেন, যা তোমাকে ইহকাল পরকাল উভয়কালেই জান্নাতের স্বাদ আস্বাদন করাবে।

ও ভাই আমার, ও বোন আমার, একটিবার নিজের দিকে ফিরে তাকাওনা, একটিবার? আর কত নিজের সাথে লুকোচুরি খেলবে? আর কত নিজেকে অনলে পোড়াবে?

আসোনা সত্য সুন্দরের কাছে, মহান সেই সত্ত্বার দ্বারে ফিরে এসোনা! দেখোই না একবার! দেখোই না তোমার জন্য কি কি অপেক্ষা করছে...নিজের স্বরূপ চিনতে তুমি আর কত দেরি করবে বলো? আর কত নিজেকে কষ্ট দেবে? আর কত? মনে রাখবে! জীবন কিন্তু একটাই। There is only one shot at life, only one!

Scanned by CamScanner

বিশ্বাস প্রতিটি মানুষেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বাস ছাড়া কোনো সুস্থ মানুষই পাওয়া যাবে না। অনেক মানুষ, হরেক রকম বিশ্বাস। কিন্তু সকল বিশ্বাসই সঠিক বিশ্বাস নয়, হতে পারে না। কেবলমাত্র একটি বিশ্বাসই শ্বাশ্বত ও নির্ভুল হতে পারে। এক শ্বাশ্বত, সঠিক ও নিখাঁদ বিশ্বাসের স্বচ্ছ জলধারা আজ ছায়াচ্ছন্ন অজস্র অবিশ্বাসের কালো আঁধারে। ফলে সেই বিশুদ্ধ জলধারাকে আজ দেখতে হচ্ছে অবিশ্বাসের রঙে, ঢঙে। ছদ্মবেশে হরেক রকম বিশ্বাস নামের কু-বিশ্বাসে বিশ্বাসের গতর জড়িয়ে আছে। বিশ্বাসের চারার সাথে লেপ্টে আছে কিছু অবিশ্বাসের আগাছা। সেই নিখাঁদ বিশ্বাসের স্বচ্ছ প্রস্রবণ থেকে অবিশ্বাসের অপছায়াগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার একটি ছোট্ট প্রয়াস 'অবিশ্বাসের বিভ্রাট'। বিশ্বাস শরীরের রক্তের মত, রক্ত মানুষের প্রাণ সচল রাখে, সেই রক্তের সাথে যখন বিষাক্ত পদার্থ মিলিত হয়ে যায় তখন রক্তকে বিশুদ্ধ করা জরুরী হয়ে পড়ে, তা না হলে মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পতিত হয়। রক্তকে বিশুদ্ধ করতে হলে রক্তের সাথে বয়ে বেড়ানো দূষিত পদার্থকে বের করে দিতে হয়। একইভাবে বিশ্বাসকে খাঁটি করতে হলেও বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস নাম নিয়ে ঘাপটি মেরে থাকা মলিন অবিশ্বাসগুলোও চিনে নিতে হবে। যাতে করে শ্বাশ্বত বিশ্বাসের বিমল জলধারা থেকে সকল অবিশ্বাসের আবাস দূর হয়ে যায়, কোনো মুখোশধারী আগাছা রূপে এগিয়ে এসে যেন বিশ্বাসকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে না পারে, বিশ্বাস যেন তার অমলিন, নির্মল আর পরিশ্রুত রূপে ফিরে আসতে পারে। যেখানে বিশ্বাস মানুষের মুক্তির একমাত্র রাজপথ। সেখানে আজ অবিশ্বাসের সেই মুখোশধারী আগাছাগুলোকে চিনে দেওয়াই আমাদের ইচ্ছা ও লক্ষ্য। একমাত্র আল্লাহ্ই তাওফীকদাতা।

Scanned by CamScanner